কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন,

ফেব্রুয়ারী, 1982 সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় শ্রীঅমরনাথ রায় ভৌত বিজ্ঞানের এবং শ্রীদিনোজ-কুমার দে জীবন-বিজ্ঞানের যে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দিয়েছিলেন তার থেকে 85·5% 73·57% Common এসেছে।

ইতি —সঞ্জয় রায় বি. ই. কলেজ মডেল স্কুল, হাওড়া-৩

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ জীবন বিজ্ঞানের Suggestion	মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮২ জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র	Suggestion-এর সঙ্গে মিলে যাওয়া প্রশ্নের Marks.	Suggestion-এর কত % Common এসেছে।
১। প্রশ্ন নং ১	প্রশ্ন নং ২	১৪	৭০ নম্বরের মধ্যে Common এসেছে ৫১·৫
২। „ ৭	১০	৫	∴ ১ নম্বরের মধ্যে Common এসেছে $\frac{৫১·৫}{৭০}$
৩। ৯	৩	৪	১০০ নম্বরের মধ্যে Common এসেছে $\frac{৫১·৫ \times ১০০}{৭০}$ = ৭৩·৫৭%
৪। ১৬	৫	৭	
৫। ১৭ (খ,গ)	১৪ (ক, খ)	৫	
৬। ২০	১১	৩½	
৭। ২০ (১)	৬	৭	
৮। „ ২০ (৬)	৪	২	
৯। ২০ (গ,চ)	„ ১২ (খ, গ)	৪	
		৫১½	

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান

আমি শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাবের একজন সদস্য। নাম শান্তনু ব্যানার্জী। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিন্নর রায়ের লেখা খুদে বৈজ্ঞানিকের আসর পড়লাম। পড়ে ভালো লাগল। এই লেখায় প্রকাশিত আমার নাম ভুল করে সান্ত্বনা ব্যানার্জি ছাপা হয়েছে। এই ভুল সংশোধন করে দিলে বাধিত হব।

ইতি—শান্তনু ব্যানার্জী

দত্তপাড়া। চাতরা। শ্রীরামপুর

●

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

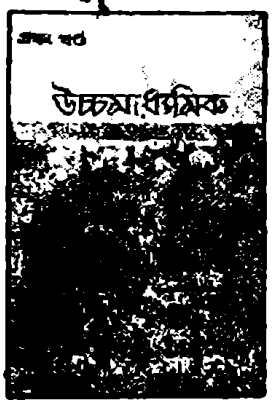

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড একাদশ শ্রেণী

⊛ প্রচুর গাণিতিক উদাহরণযোগে, নানা রাসায়নিক গণনা সহজবোধ্যভাবে করে দেওয়া আছে। ⊛ অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ধরনেরই প্রশ্নের সংকলন (এবং গ্রন্থে তার উত্তর) করা হয়েছে। ⊛ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের সাধারণ ত্রুটি ও তার সংশোধন এবং কিছু আদর্শ প্রশ্নোত্তর দিয়ে একটি বিশেষ উপযোগী অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ⊛ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, কিছু উত্তর পৃথকভাবে করা হয়েছে। ⊛ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি—প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ॥ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥ মে ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এক বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়ল। নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আরও ঝকমকে আরও আকর্ষণীয়। নতুন প্রচ্ছদ শুধু নয়, নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস, নতুন নতুন অনেক ফীচারও শুরু হয়েছে—এই নববর্ষ থেকেই। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর রচনা প্রতিযোগিতায় যারা লেখা পাঠিয়েছ, তাদের সব লেখা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—বিচারকমণ্ডলীর কাছে। যার ফলাফল তোমরা জুন মাস নাগাদ জানতে পারবে। তোমরা সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নাও।

॥ সূচীপত্র ॥

চিঠিপত্র : ১
সম্পাদকীয় : ২

দপ্তর থেকে
সমুদ্র অভিযানে ভারত : সমরজিৎ কর ৩

উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ : অদ্রীশ বর্ধন ৯
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৩৩

পড়াশোনা
রসায়নের সহজপাঠ : অমরনাথ রায় ২২
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : তারকমোহন দাস ৩৬
আলোকের প্রতিফলন : ডঃ অলক চক্রবর্তী ৪৬
চিরকালের ত্রিভুজ : অরূপরতন ভট্টাচার্য ৪৪

পশুপাখীর পরিচয়
বসন্ত বউরি পাখিদের কথা : অজয় হোম ২৯

ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে : দেবদাস ৩২
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস ৪৩
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দি সী : গৌতম কর্মকার : প্রচ্ছদ : ২
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল ৫৬
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ৪২

বিবিধ
ভাবনা : অনির্বাণ চক্রবর্তী ৫
টুকিটাকি : ৮
দুটি বিজ্ঞান ক্লাব : কিন্নর রায় ৭
ধাঁধা : সুনীত রায় ২৮
নোবেল পুরস্কার ১৪

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
বই আর বই : ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ৬
মাটি থেকে আকাশে : পার্থসারথি চক্রবর্তী ৩৯
গ্রহ পরিচয় ॥ সৌরজগৎ : বিমান বসু ১৮

বিজ্ঞানের বিস্ময়
চোখের নজর আর চশমা : অমিতাভ সেন ১৫
ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : স্বপনবুড়ো ২৯

আবিষ্কারের গল্প
স্বপ্ন থেকে আবিষ্কার ১৬

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর দাতাদের নাম : ৪৯
প্রশ্নোত্তর ৫০ ॥ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ৫০
মার্গোলিকা : উজ্জ্বলকুমার রায় ৫১
ওয়াটার হিটার : সুবীর বিশ্বাস ৫৩
ফুলের ফসল : অনুপ ঘোষ ৫৪
শব্দকূট : স্বাতী রায় ৫৫

সমুদ্র অভিযানে ভারত

সমরজিৎ কর

১৯৮২ সাল দুটি কারণে তোমাদের জীবনে নিশ্চয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একটি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষিণ মেরু মহাদেশ অভিযান। অপরটি ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ ইনসাট-১ এর মহাকাশে উৎক্ষেপণ। উপগ্রহটির পুরো নাম অবশ্য ইনডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট। সেটি

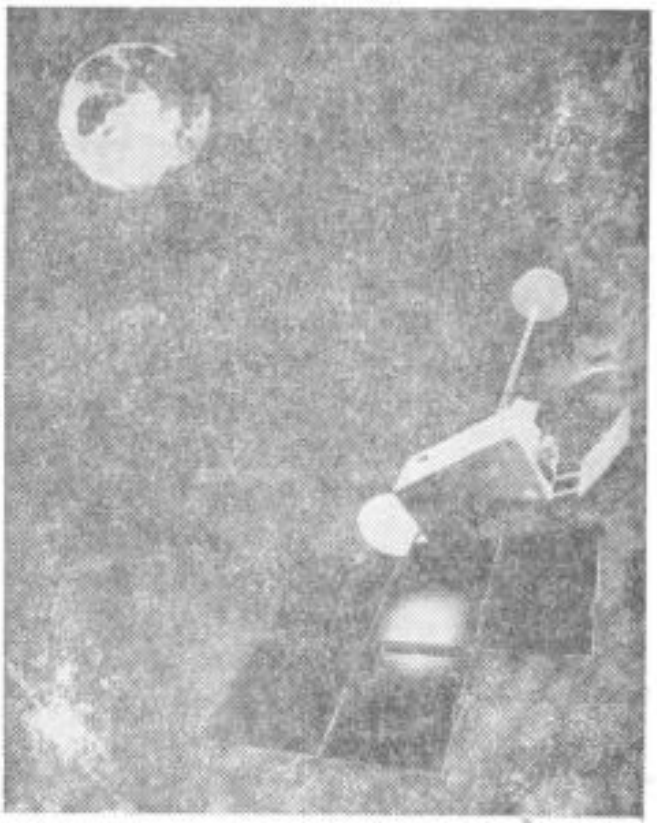

ইনসাট ১ মহাকাশে

সংক্ষেপ করে বলা হচ্ছে 'ইনসাট'। এটির পরিকল্পনা করেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা। তাঁদের পরিকল্পনা মত মার্কিন দেশের ফোর্ড এরোস্পেস করপোরেশন নামে একটি সংস্থা উপগ্রহটি তৈরি করে। ১০ এপ্রিল, ১৯৮২ একটি মার্কিন রকেট 'ডেলটা-৩৯১০'-র সাহায্যে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে এটিকে মহাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়। এ কাজে আমাদের সাহায্য করে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা সংক্ষেপে 'নাসা'। উপগ্রহটি আমাদের টেলিফোন, টেলিভিশন এবং রেডিও কার্যসূচী প্রসারে সাহায্য করবে। এ ছাড়া নিয়মিত আবহাওয়া বিষয়ক তথ্যাবলী জানার ব্যাপারেও কাজ করবে। পৃথিবীর এটাই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, যার সাহায্যে একই সঙ্গে এত সব কাজ চালান সম্ভব হবে। আগামী মাসে এটির কাজ নিয়মিত চালু হবে। তখন এ সম্পর্কে আরও অনেক কথা তোমাদের বলব। তার আগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমুদ্র নিয়ে কত কি করেছেন সেটাই বরং বলি, কেমন?

গোয়ার রাজধানী পানাজি। পানাজি পাহাড়ে শহর। এর দক্ষিণ দিকে দোনা-পাউলায় উঁচু একটি টিলার উপর তৈরি হয়েছে ভারতের সমুদ্র বিষয়ক গবেষণার গবেষণাগার। নাম ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ্ ওসেনোগ্রাফি। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরের শেষে এখান থেকে দক্ষিণ মেরু মহাদেশে একটি জাহাজ পাঠান হয়। নাম 'পোলার সার্কল'। এই জাহাজে ছিল সামুদ্রিক আবহাওয়া সম্পর্কে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করার যন্ত্রপাতি। অভিযানের নেতা ছিলেন বিশিষ্ট সমুদ্র বিজ্ঞানী ডঃ এস. জেড. কাসিম।

কয়েক সপ্তাহ আগে গিয়েছিলেম গোয়ার সেই সামুদ্রিক গবেষণাগার দেখতে। সেখানেই শুনলাম দক্ষিণ মেরু অভিযানের ব্যাপারে নানা রকম কথাবার্তা। একজন বিজ্ঞানী বললেন, এই অভিযান চালাতে গিয়ে নানা রকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কুমেরু মহাদেশ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জায়গা। যেখানে ওঁরা গিয়েছিলেন সেখানকার তাপমাত্রা ছিল শূন্যের নিচে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানে বরফ আর বরফ। সেই ঠাণ্ডায় যাতে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করতে পারেন তার জন্যে আগে থেকেই অভিযাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেন হিমালয়ের বরফ ঢাকা অঞ্চলে গিয়ে। এ ছাড়া দারুণ ঝড়ো আবহাওয়াও সহ্য করতে হয়েছে তাঁদের। সেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ভয় ছিল।

আমার কথা শুনে এক্ষুনি হয়ত জিজ্ঞেস করবে এত যখন ঝক্কি, তখন কি লাভ সেখানে গিয়ে?

আছে। নিশ্চয় লাভ আছে। দক্ষিণ মেরুতে প্রচুর

বরফ। পাহাড় পর্বত সুমেরু কুমেরু মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে যত বরফ পড়ে রয়েছে তার শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ বরফ পাবে কুমেরু মহাদেশে। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দপ্তর বলছে, গত একশ' বছরে আমাদের আবহাওয়ার তাপমাত্রা নাকি বেড়েছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত। আরও নাকি বাড়বে। এর জন্যে দায়ী কলকারখানা, মোটরগাড়ি প্রভৃতি থেকে ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। উষ্ণতর অবস্থা কুমেরু মহাদেশের বরফ গলানর ব্যাপারে অথবা বরফের বাষ্পীভবন করার ব্যাপারে কতটা সাহায্য করছে, বিজ্ঞানীরা তা জানতে চান। কারণ এর উপর আমাদের আবহাওয়া কেমন যাবে সেটা নির্ভর করছে। মেরু অঞ্চলে মহাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নানা রকম মহাজাগতিক কণা বা রশ্মি। বৈদ্যুতিক আধান সমন্বিত সেই সব কণা কুমেরুর আবহাওয়া মণ্ডলে এসে কি ধরনের বিক্রিয়া করে সেটা জানা গেলে আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁরা নতুন তথ্য জানতে পারবেন। এতে করে কখন কোথায় জল ঝড় কুয়াশা হবে আগে থেকে আমরা জানতে পারব। বিমান এবং জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন করতে গেলে এটা জানা দরকার। তেমন কোন ঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে স্থল ভাগে যারা বাস করে তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

শুধু আবহাওয়াই নয়। কুমেরু সাগরে রয়েছে প্রচুর মাছ। কুমেরু মহাদেশে সন্ধান পাওয়া গেছে করলা, লোহা, নিকেল, কোবল্ট, এমন নানা রকম মূল্যবান খনিজ সামগ্রী। এ সব সংগ্রহ করা গেলে কত লাভ। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কুমেরু অভিযানের এটাও অন্যতম উদ্দেশ্য। কোথায় কি রয়েছে এ ধরনের অভিযান তাঁদের সে সব জানার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

কুমেরু তো একটা দিক। গোলা-পাউলার এই গবেষণাগার আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহা-সাগরেও নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা। ভারতীয় এলাকার সমুদ্র যাতে ভাল-ভাবে সংরক্ষণ করা যায় তার চেষ্টা করা, সেখান থেকে যাতে সম্পদ সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করা।

আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে সারা বছর ধরে চলে জাহাজ। সেই সব জাহাজ থেকে তেল, তেলের আলকাতরা, নানা রকম জঞ্জাল ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। বছরে হাজার হাজার টন। এই সব বস্তু সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষতি করে। ভারতের পশ্চিম এবং পূর্ব উপকূলে কত নদী-নালা। সেই সব নদী-নালা কলকারখানা এবং শহর অঞ্চলের জঞ্জাল গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। চাষের জমিতে আমরা ছড়াই কীটনাশক ওষুধ। বৃষ্টির জলে সেই ওষুধের বড় রকমের একটি অংশ ধোয়ানি হিসেবে নদী এবং নালা পথে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই সব জঞ্জাল সমুদ্রের মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রচুর ক্ষতি করেছে। কোন কোন অঞ্চলে মাছ আর পাওয়া যায় না বললেই চলে। এমন ক্ষতি কিভাবে হয়, কি করলে ক্ষতি কমান যায় তা নিয়ে গবেষণা করছেন গোয়ার এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা।

গবেষণার জন্যে ওঁদের রয়েছে আধুনিক একটি জাহাজ। তার নাম 'আর. ভি. গবেষণী'। এই জাহাজে রয়েছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি। এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা, কোন অঞ্চলের জলে কতটা লবন, সমুদ্রের নিচে কোথায় কি ধরনের ভূস্তর রয়েছে, কি ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদ রয়েছে, সমুদ্রের জলের তাপ-মাত্রা, স্রোতের গতি, কোথায় কতটা জঞ্জাল জমছে, এমন অনেক ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা।

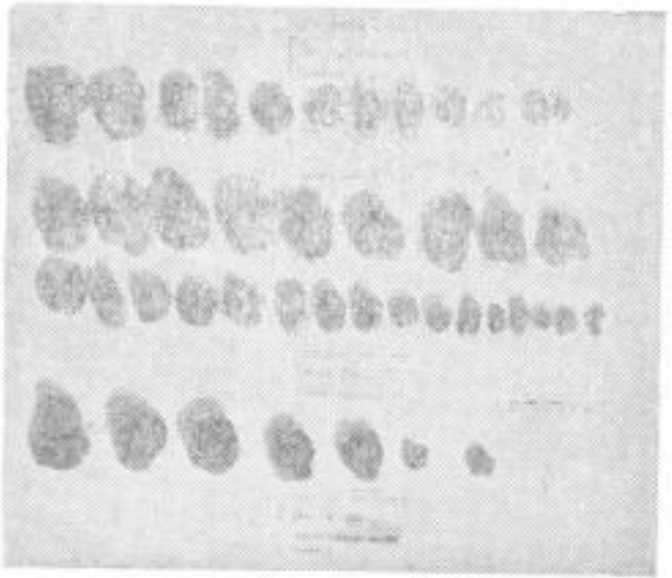

ভারত মহাসাগর থেকে নিয়ে আসা ম্যাঙ্গানীজের নুড়ি

কন্যাকুমারী থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরের নিচে—তা সেখানকার গভীরতা প্রায় ৩·৬ কিলোমিটার—পাওয়া গেছে ম্যাঙ্গানিজের নুড়ি। এই সব নুড়ির মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, নিকেল, কোবলট, তামা। বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই নুড়ি। এদের সংগ্রহ করার ব্যাপারেও কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা।

জানো নিশ্চয়—ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০০ কিলোমিটার, পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল মিলিয়ে।

উভয় উপকূলে রয়েছে বড় রকমের দশটি বন্দর। তেইশটি মাঝারি এবং ১৬৮টি ছোট বন্দর। সমুদ্রের ঢেউ যাতে এই সব বন্দরের ক্ষতি না করে তা নিয়েও ভাবছেন গোয়ার বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের উপকূল যাতে না ভাঙ্গে তার জন্যেও ওঁরা কাজ করছেন।

সমুদ্রে রয়েছে কত রকম উদ্ভিদ। এই সব উদ্ভিদ মাছ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর খাবার। কোন কোন উদ্ভিদ আবার নানা রকম রোগের ওষুধ যোগায়। এই সব রোগের মধ্যে রয়েছে উদরাময়, ক্যানসার, বাত, ভাইরাস ঘটিত রোগ, ছত্রাক রোগ প্রভৃতি। চিকিৎসার সময় অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে অজ্ঞান করতে হয়, অথবা তার শরীরের কোন অংশ অবশ করে নিতে হয়। এ সব কাজের ওষুধও পাওয়া গেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে চলে উষ্ণ সমুদ্র স্রোত। সোহেলের পাশ দিয়ে এই স্রোত পুব দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে আসে ভারতের দিকে। এর ফলে ভারতের জল-হাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে। কী ভাবে ঘটে—তা জানার ব্যাপারেও গবেষণা করছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের এক এক অঞ্চলে চলেছে এক এক রকম স্রোত। তাদের গতিও ভিন্নতর। কোন্ পথে জাহাজ চললে সেই স্রোতের সুযোগ নেওয়া যায়, সহজে কম তেল পুড়িয়ে দূরত্ব অতিক্রম করা যায়—এমন ব্যাপার নিয়েও তাঁরা গবেষণা করছেন!

এসব কাজে ঝুঁকি অনেক। কখনও প্রচণ্ড ঢেউ-এর উপর জাহাজ চালিয়ে, কখনও ঝড়ের মধ্যে প্রাণ হাতে কাজ করেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের সাফল্যে তোমরা গর্ব বোধ করবে।

ভাবনা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

তেলে-জলে মিশ খায়?

খায় না কেন? তেল এবং জল একসঙ্গে না মেশার কারণ হল এদের অণুগুলির মাপের বিভিন্নতা। তেলের অণুগুলি আকারে জলের অণুগুলির চেয়ে অনেক বড় এবং প্রতিটি তেলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা, প্রতিটি জলের অণুতে অবস্থিত পরমাণুর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

যে সব তরলেরা মিশে যায়, তাদের অণুগুলি একই ধরনের হওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে সহজে যুক্ত হতে পারে। এর একটা হল দুধের মিশ্রণ আর জল।

জলের উপর তেলের স্তর বৃত্তাকার হওয়ার মূলে আছে পদার্থের অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ। একই পদার্থের অণুগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণকে সংসক্তি বলা হয়। সংসক্তি বলের জন্য তরল পদার্থে এমন এক ধর্ম দেখা যায়, যাকে বিজ্ঞানীরা 'পৃষ্ঠটান' বলে অভিহিত করেছেন। তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে সংসক্তি বলের ক্রিয়ায় এর বাইরের দিকের তল স্থিতিস্থাপক চামড়া অথবা রবারের বেলুনের খোলকের মতো ব্যবহার করে। আকর্ষণের জন্য তরলের অণুগুলি যথা সম্ভব ছোট আয়তনের মধ্যে জড়ো হবার চেষ্টা করে। এই প্রবণতার জন্য জলের উপর তেলের স্তর বৃত্তাকারে বিন্যস্ত হয়ে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রফল দখল করে থাকে।

ছোট্ট পরীক্ষা: একটি কাপের অর্ধেক জলপূর্ণ করা হল। এতে দু'চার ফোঁটা সরষের তেল ফেলে দেওয়া হল! কি দেখবে? এবার কাপের ভিতর এক টুকরো সাবান ফেলে দাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর! কি দেখবে?

ভ্রম সংশোধন

গত মাসে ডঃ অলক চক্রবর্তীর আলোকের প্রতিফলন নামে লেখাটায় ব্লক-সজ্জার একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। চিত্র-৯ এবং চিত্র-১১ স্থান পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ যেটা চিত্র-৯ বলে দেখানো হয়েছে, সেটা চিত্র-১১ হবে এবং যেটা চিত্র-১১ বলে দেখানো হয়েছে, সেটা চিত্র-৯ হবে। এছাড়া চিত্র-৪ ব্লকটি উল্টো বসেছে! আর চিত্র নং-১২ এবং চিত্র নং-১৪, এদু'টিও বদলে গেছে। ১২ নং হবে ১৪ আর ১৪নং হবে ১২।

এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বিশ্বাসের 'যমের খাস দূত' রচনাটিতে সমুদ্র বোলতার ছবি উল্টে ছাপার জন্য আমরা দুঃখিত।

শ্রীঅনীশ দেবের প্রবন্ধ 'সূর্য কত দিন বাঁচবে' রচনাটির ৭ম পাতার ৩০ লাইনে আধ মিনিটের জায়গা আট মিনিট পড়তে হবে।

বই আর বই

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

সম্প্রতি সপ্তম বই মেলা হয়ে গেছে কলকাতায়। এই বই মেলা এখন সারা ভারতেই হয় এখানে ওখানে। কলকাতা তো সারা বছর পথ চেয়ে থাকে এই বই মেলার। কতো বই। দেখে আশ মেটে না, নেড়ে চেড়ে আশ মেটে না। মনে হয় সবগুলো যদি কেনা যেত, সবগুলো যদি পড়া যেত। আহ্।

তা বইয়ের কথাই কিছু হোক্। কলকাতার বই মেলা আর কতোটাই বা জায়গা জুড়ে। তাতেই অবশ্য আমরা হিমসিম। লণ্ডনে ডব্লু অ্যাণ্ড দি ফয়েল লিমিটেডে'র, ১১৯—১২৫ চেয়ারিং ক্রশ রোডে যে বইয়ের দোকান তার আয়তন ৭৫৮২৫ স্কোয়ার ফুট; বইয়ের তাক সব জুড়লে ৩০ মাইল। কলকাতার বই মেলার গোটাটাই হেসেখেলে ঢুকে যাবে।

এরো থেকে বড়ো বইয়ের দোকান হলো নিউইয়র্কের ফিফ্‌থ অ্যাভিনুর এইটিন্‌থ্ স্ট্রীটে 'বার্নেস নোবল বুক স্টোরস' এঁদের দোকানের আয়তন হল ১৫৪,২৫০ স্কোয়ার ফুট; বইয়ের তাকের মোট দৈর্ঘ্য ১২·৮৭ মাইল।

পুরনো বইয়ের দোকানের মধ্যে বড়োসড়ো হল ওয়েলসে 'রিচার্ড বুথ বুকসেলার্সের'; আয়তন ৩০,০৯১ স্কোয়ার ফুট। বই আছে ৯ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ।

কলকাতার বই পাড়া কলেজ স্ট্রীটের মতো টোকিওর বই পাড়া হল জিম্বোচো। এই জিম্বোচোতে একটি আটতলা বাড়ী জুড়ে একটি নতুন বইয়ের দোকান খোলা হয়েছে, এই মার্চ ১৯৮২ তে যার মধ্যে বই-বই-বইয়ের মেলা। কলকাতার বইমেলা তার একতলারও পুরোটা ভরায় না। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লক্ষ লক্ষ বই আছে, আর আছে একটি তথ্য সরবরাহ বিভাগ যেখানে দুনিয়ার সব বইয়ের সব খবর চটজলদি পাওয়া যাচ্ছে। জিম্বো চো পাড়ায় পাতাল রেল পৌঁছেছে। বই বিলাসীদের জন্যে আরো একটি পাতাল রেলের লাইন তৈরী হচ্ছে!

সব থেকে পুরনো লিখিত লিপির বয়স ৩৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে সুমেরীয় সভ্যতার শিলালিপি। প্যাপিরাসে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে ৩৭৫ খৃস্ট পূর্বাব্দের। কোরিয়া থেকে কাঠের ছাঁচে ছাপা পুঁথির বয়স আনুমানিক ৭০৪ খৃস্ট পূর্বাব্দ। ধাতুর টাইপে ছাপা, প্রথম ছাপা বই বলে দাবী যে বইয়ের—তা হল তাং বংশের একটি কবিতার বই (আনুমানিক ১১৩০ খৃস্টাব্দ)। এ দাবী এখনো অবশ্য ঠিক স্বীকৃত হয়নি।

সব প্রথম মুদ্রাযন্ত্রে প্রামাণ্য ছাপা বই হল ১৪৫৪ সালের 'গুটেনবুর্গ বাইবেল'; এটি ছাপান হয় জার্মানীর মেইনজে, মুদ্রক Johann Henne Zum Gensflecisch Zur Laden ওরফে Zn Gutenberg। প্রাচীন ছাপা বইয়ের আরেকটি হল 'ডোনাটাস'। এটি লাটিন গ্রামার। আরেকটি সঠিক সন তারিখ সহ ছাপা বই 'Psalter'; (১৪ই আগস্ট, ১৪৫৭); মুদ্রক জোহান ফাস্ট এবং পিটার স্কফের। পিটার স্কফের ছিলেন গুটেনবার্গেরই প্রধান সহকারী। উইলিয়াম ক্যাক্সটনের ছাপা "The Recuyel of the Historyes of Troye' ছাপার আনুমানিক কাল ১৪৭৩—১৪৭৪।

খণ্ডে খণ্ডে ছাপা পৃথিবীর বৃহত্তম বই কি? 'British Parliamentary Papers'। এর মোট খণ্ড ১১১২টি। ওজন ৩·৬৪ টন, খরচ পড়েছে ৬৯০০০ পাউণ্ড। এ বই বাঁধাতে লেগেছে ৩৪০০০ ছাগচর্ম এবং সোনার জলে বাঁধাতে সোনার বাট লেগেছে ৩৯০০০ পাউণ্ড মূল্যের। বইটি দিনে ১০ ঘণ্টা একটানা পড়ে শেষ করতে, সময় লাগবে মাত্র ৬ বছর!

আয়তনে সব থেকে বড়ো বই Super Book'; সাইজ—লম্বা × চওড়া × উচ্চতা : ১০ ফুট × ৯ ফুট × ২½ ইঞ্চি। এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০, ওজন ৫৭৭ পাউণ্ড। প্রকাশ হয়েছে ডেনভার, কোলো থেকে ১৯৭৬ সালে।

মিনি বই কতটুকু? কতো মিনি? মিনির ব্যাপারে টেক্কা দেয় জাপান। জাপানের টোকিওতে আসাও হোসিও ছোটদের জন্য একটি গল্পের বই প্রকাশ করেছেন জুন, ১৯৮০ সালে। বইটির নাম 'Ari' 'পিঁপড়ে'। বইটির সাইজ লম্বা × চওড়া; ⅛ ইঞ্চি × ⅛ ইঞ্চি।

সব থেকে কোন্ বইয়ের দাম বেশী। পৃথিবীর মোট ২১টি গুটেনবুর্গ বাইবেলের একটি, কিনেছেন টেক্সাস ইউনিভার্সিটি ১৯৭৮ সালের ৯ই জুন। দাম পড়েছে ২,৪০০, ৪০০ ডলার।

এমনি একটি দামী কেনাবেচা হয়েছে ১৭৭৬ সালের ছাপা স্বাধীনতার ইস্তাহার (The Declaration of Independance)। দাম পড়েছে ৪০৪,০০০ ডলার। কিনেছেন একজন টেক্সাসবাসী।

তা ছাপা ইস্তাহারই কি সব? ছাপা ম্যাপ (ষোড়শ শতাব্দীর) তাও বিক্রী হয়েছে ৬৯৭,০০০ ডলারে।

উপন্যাস পড়তে সবাই ভালোবাসে। তা বড়ো উপন্যাসের খবর কি? লুই হেনরি জাঁ ফারিগুয়োল ১৯৩২ সালে সুরু করে ১৯৪৬ সালে যে উপন্যাসটি শেষ করেন, তার খণ্ড মাত্র ২৭টি। উপন্যাসটির ইংরেজী তর্জমা 'Men of Good will' বই আকারে যখন বেরোয়, তখন পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯৫৯। এর কাছাকাছি সাইজের উপন্যাস লিখেছেন সোহাচি ইয়ামায়োকা ; এর খণ্ড হয়েছে ৪০। সময় লেগেছে ১৯৫১—১৯৮১।

পৃথিবীর সব থেকে সর্বজন পরিচিত বই 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।' এটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৭৬৮-১৭৭১। বর্তমান যে পঞ্চদশ সংস্করণ তার ৩০টি খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩,১৪১ ; এতে শব্দ সংখ্যা ৪৩০ লক্ষ।

সূচী বা নির্ঘণ্টের তালিকার শীর্ষে হল Chemical Abstracts. ১৯৭৮ সালের ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত এতে ২০,৫৫০,০০০টি বিষয় সূচীভুক্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫,৮৮২, ৫৭টি খণ্ড, ওজন ২৫১ পাউণ্ড।

তা অভিধানের খবরটাও নেয়া যাক্। ইংরেজীর বৃহত্তম অভিধান—'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারি' ; পৃষ্ঠা ১৫৪৮৭, প্রকাশকাল ১৮৮৪—১৯২৮। ১৯৬৩ সালে এর একটি সংযোজনী বেরিয়েছে আরো ৯৩৩ পাতা। এর আরো চারটি সংযোজনী প্রকাশের অপেক্ষায়। এতে তালিকাভুক্ত শব্দ ৪,১৪,৮২৫ ; উদ্ধৃতি আছে ১,৮৭,৩০৬।

জার্মান ডিক্শনারী Deutcher Worter buch সুরু করেন জ্যাকব ও উইলহেলম প্রিস ১৮৫৪ সালে। ১৯৭১ সালে এটি শেষ হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪,৫১৯ ; ৩৩টি খণ্ড।

পৃথিবীর সব থেকে বেশী প্রচারিত বই—বাইবেল। ছাপা হয়েছে ১৭১০টি ভাষায়। ১৮১৫ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাইবেল ছাপা হয়েছে ২৫০০,০০০,০০০। ১৯৮০ সালে ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি বিতরণ করেছে ৯,৬৫৩,৫০৮টি বাইবেল।

যে গ্রন্থকারের বই সব থেকে বেশী বিক্রী হয়েছে তিনি আর্লে স্ট্যানলী গার্ডনার ; ৩৭টি ভাষায়, তার বিক্রীত বই—৩১৩,১৬৯,৮২৭ কপি। এর পরের আসন আগাথা ক্রিস্টির ; ১০৩টি ভাষায়, তাঁর বিক্রী বইয়ের সংখ্যা ৩০০,০০০,০০০।

সব থেকে কম সময়ে সব চেয়ে বেশী বিক্রী যে বইয়ের (সপ্তাহে ৬০০০০ কপি) তা হল 'গিনেস বুক্ অফ্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' যার থেকে এ লেখারও নানা তথ্য সংগৃহীত। সবথেকে দ্রুত ছাপা বই 'Miracle On Ice' ; ছেপেছেন 'ব্যাণ্টাম বুক্স্' সময় লেগেছে মাত্র ৪৬½ ঘণ্টা।

দুটি বিজ্ঞান ক্লাব

কিন্নর রায়

১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সপ্তর্ষি সায়েন্স ক্লাব তৈরী হয়। একদম শুরুতে ছিল পাঁচজন সদস্য। বেড়ে বেড়ে তা এখন দাঁড়িয়েছে পঁচিশে। ক্লাবের নিজের কোন ঘর নেই। একজন সদস্য মণীশ গাঙ্গুলীর বাড়িতেই ঠিকানা ১/২১বি, চিত্তরঞ্জন কলোনি। কলকাতা-৩২।

বিশ্বনাথ আন্ডি আর প্রদীপ দাশগুপ্ত যৌথভাবে এই বিজ্ঞান ক্লাবের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সপ্তর্ষি সায়েন্স ক্লাবের সদস্যরা মিলিত হন প্রদীপ দাশগুপ্তর বাড়ি। নানা বিষয়, ভবিষ্যত কর্মসূচী—এসব নিয়ে আলোচনা হয়।

সপ্তর্ষি সায়েন্স ক্লাব এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ও প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে আছে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের পরিচালনায় অষ্টম রাজ্যস্তরে বিজ্ঞান মেলা ও বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের বিজ্ঞান মেলা।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষের প্রায় শেষ লগ্নে সপ্তর্ষির জন্ম। সে কথা মনে রেখেই বোধহয় এদের প্রথম বছরের মডেলে প্রতিবন্ধীদের জন্যে সমবেদনা ও সহযোগিতার সুর বেজে উঠেছে। মডেলের নাম দৃষ্টিহীনের নির্দেশক লাঠি। এই লাঠি জল-কাদার ছোঁয়া পেলেই ব্যাটারি ও তারের কারিকুরিতে কাঁ্যা কাঁ্যা করে ডেকে উঠবে। সতর্ক হয়ে যাবেন লাঠি-ধরা দৃষ্টিহীন মানুষটি। এর মধ্যেই বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে এই লাঠি যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে এদের আর একটি মডেল হলো সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ।

সপ্তর্ষি সায়েন্স ক্লাবের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই সংস্থার আগামী কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, পাড়ায় ও বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী করা, মডেলিং সেণ্টার খোলা, নিয়মিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগ দেয়া। সপ্তর্ষির প্রতিটি সদস্যের বিশ্বাস তাদের এই সমস্ত স্বপ্নই সফল হবে।

যাদবপুরের এই চিত্তরঞ্জন কলোনিতেই আর একটি বিজ্ঞান ক্লাব আছে। নাম কসমিক সায়েন্স ক্লাব। বছর তিনেক আগে ক্লাবটি তৈরী হয়েছে। সদস্য সংখ্যা ২৫। এর ভেতর চারজন মেয়ে। চারটি মেয়ের নাম—পাঞ্চালী, মিতালী, সুতপা আর মুন্না। ক্লাবের পরিশ্রমী ছেলেদের মধ্যে আছে দিব্য, অরূপ, দেবুল, নাণ্টু, অংকুর। দিব্যই এদের গ্রুপ লিডার।

টুকিটাকি

কৃত্রিম দেহত্বক

বর্তমানে আগুনে পুড়ে গিয়ে চামড়া নষ্ট হয়ে গেলেও তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। অবশ্য স্বাভাবিক দেহত্বক কৃত্রিম উপায়ে ম্যাসাচুসেটস ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজী ও হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের যৌথ উদ্যোগে গবেষণাগারে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। এই কৃত্রিম ত্বক সাধারণ ত্বকের মতোই ব্যাকটিরিয়ার হাত থেকে দেহকে রক্ষা করছে। বর্তমানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এই ত্বকের লোমকূপের ভেতর দিয়ে শরীরের বর্জ্যপদার্থ ঘামের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

মানবমনে চাঁদের ক্রিয়া

চাঁদ দেখে আমরা কেউই দুঃখ পাই না বরং পূর্ণিমা রাতে ভরা চাঁদে আগ্রার তাজমহল দেখতে পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। বহু বছর ধরেই সাহিত্য আর গবেষণায় চাঁদ একটা আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে সর্বাগ্রে স্থান পেয়ে এসেছে। চাঁদ দেখে যে কত লোক পাগল হয়ে গেছে তা আমরা লুনাটিক্‌ কথা থেকেই বুঝতে পারি। বর্তমানে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে চাঁদ মানুষের দেহে ও মনে একটা বিশেষ ক্রিয়া করে।

মানবমনে চাঁদের প্রতিক্রিয়ার উপর চিকাগোর ইলিনোস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজী বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ র‍্যাল্ফ্‌ ডবল্যু, মরিস দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ণ চাঁদে মানবদেহে উৎসেচক ও হরমোনের বৃদ্ধি ঘটে একটু বেশী মাত্রায়। তার ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া কিম্বা বাতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন এই সময়ে মরফিন জাতীয় ড্রাগ দেহে একটা প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে।

বহু মনস্তাত্ত্বিক ও পুলিশের একটা সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গেছে যে যারা খুনী তাদেরও এই ভরা চাঁদে খুন করার প্রবণতাটা বেশী দেখা যায়। আমেরিকার কুখ্যাত খুনী ডেভিড বার্কোউইট্‌জ্‌ এক বছরে আটটা খুন করেছে যার মধ্যে পাঁচটা খুন হয়েছে ভরা জ্যোৎস্নায়।

পাটনা মেডিক্যাল কলেজের একদল ডাক্তার মনে করেন যে পূর্ণ চাঁদে যেমন সমুদ্রের জলে স্ফীতি দেখা দেয় সেরকম মানবদেহেও দেহরসের স্ফীতি হয় যার ফলে এ সময়ে খাদ্য হজম করার শক্তিও কমে যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে এই তথ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে চারিত্রিক পরিচয়

প্রত্যেক মানুষেরই মুখের আদল যেমন ভিন্ন ঠিক তেমনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরনও ভিন্ন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মানুষের দৈহিক কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন আনে না, কিন্তু চারিত্রিক গঠন প্রণালীর উপর একটা বিশেষ ছাপ ফেলে বলে নিউ ইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ডঃ শেইলা. এম. হাস মনে করেন। তিনি একশো ষাটজন বয়স্ক ব্যক্তির উপর তাঁর গবেষণা কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন। তাদের প্রত্যেকের শ্বাস-প্রশ্বাস ভালোভাবে পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন, যে সব মানুষ আস্তে অথচ গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, সাধারণত তাঁরা —দৃঢ়, শক্তিশালী, দুঃসাহসিক অভিযানে আগ্রহী, দৈহিক ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি প্রবল এবং জীবনের যে কোন পর্যায়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সদাই সচেষ্ট। দ্রুত অথচ হাল্কাভাবে যাঁরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, তাঁরা ভীরু, কাপুরুষ এবং সর্বদা পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে মনে মনে পোষণ করেন। ডঃ হাস এবং তাঁর সহযোগীরা এখনো কোনো সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি—কি করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে একটা মানুষের চারিত্রিক কাঠামো বোঝা সম্ভব। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁরা আরো গভীরভাবে গবেষণা করে যাচ্ছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে, তা ডঃ হাস নিজেই স্বীকার করেছেন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃস্ট্যালের ভেতর মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস্ ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট চোঙার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে।

বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ—দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোমস্‌কেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার।

মিসেস হাডসনকে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন শার্লক হোমস্। লণ্ডন শহর এখন জনশূন্য। শুধু শোঁ-শোঁ সাইরেনের আওয়াজ—আর মঙ্গলের দানব তাণ্ডবলীলা। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে আতঙ্কিত ইন্‌সপেক্টর হপকিন্সের সঙ্গে। হোমস্‌ের হাতে সময় নেই। কারণ জরুরী তথ্য পাওয়া গেছে মঙ্গলগ্রহীদের আচরণে। লাল ফুলগুলো মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। তবে কি সত্যিই পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব?

ওয়াটসনের কথা ভেবে হোমস্ চিন্তিত। এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জারই বা কোথায় নিখোঁজ হলেন? পৃথিবীকে কি তিনি মঙ্গলগ্রহীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?

গোটা লণ্ডন শহর যেন জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোনমতে জেসিকে জাহাজে তুলে দিয়ে চ্যালেঞ্জার রয়ে গেলেন। আর সেই সময়েই শুরু হল মঙ্গলগ্রহীদের নীল বিদ্যুৎ বর্ষণ। খুব দ্রুত নিজের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলো প্রফেসর। আর সেই সময়েই চাঁদের আলোতে কার যেন ছায়া সামনে পড়ল। চোখের পলকে এগিয়ে এল জিঘাংসায় উন্মত্ত ধাতুর শুঁড়। প্রফেসর চট্ করে ঘরে ঢুকলেন। মঙ্গলগ্রহীদের হাত থেকে কোনওক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রফেসর এলেন—বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে। সেখানে পরিচিত হলেন, হোমসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ওয়াটসনের সঙ্গে। তারপর শুরু হল সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা—মঙ্গলগ্রহীদের হাতেনাতে জ্যান্ত ধরতে হবে।

ওয়াটসন কারো আত্মম্ভরিতা একদম সইতে পারে না। বাঁকা সুরে বললে—"পালিয়ে এসে অভিযান ভণ্ডুল করতে চান করুন। কিন্তু অক্টোপাসের মত চেহারা যাদের তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।"

"মাই ডিয়ার ডাক্তার" বিনয়ক্ষরিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। "ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটও রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করে পরে বিজয়ী হয়েছিলেন। ইতিহাসে এমন নজীর ভূরি ভূরি আছে। আর অক্টোপাসের মত চেহারা যাদের বলছো, তাদের ব্রেন নেই একথা ভুলেও মনে করবে না। যেমন জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জারের চেহারাটা গরিলার মত—কিন্তু সুপার ব্রেনের অধিকারী সে। ঠিক তেমনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদের ঐ থলথলে দেহটা আসলে পুরোপুরিই ব্রেন। লিকলিকে শুঁড়গুলোর কাজ কেবল যন্ত্রপাতি নির্মাণ আর চালনা করা। গতর খাটানোর দরকার হয় না বলেই গতর বড় হয়নি—ব্রেন খাটিয়ে ব্রেনটাই কেবল বড় করেছে—পৃথিবীর সব বড় বৈজ্ঞানিকই যা করেন।"

ওয়াটসন বিরক্তি গোপন করে বললে—"এঁকে দেখাতে পারেন একটা জীবকে? আমার দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি।"

"নিশ্চয় দেখাতে পারি। তারপর 'জ্যান্ত একজনকেও' দেখাবো বলে' দাড়ির ফাঁক দিয়ে মুচকি হেসে হোমসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে খাতা পেন্সিল টেনে নিয়ে ঝপাঝপ একটা কিম্ভূতকিমাকার জীবের ছবি এঁকে ফেললেন—যার মুখবিবর ত্রিভুজের মত, চোখ ভাঁটার মত, মুখবিবরের দুপাশ দিয়ে ঝুলছে কতকগুলো লিকলিকে শুঁড়। বাদবাকী শরীরটা ভিস্তিওয়ালার জলভর্তি চামড়ার থলির মত বিপুল।

প্রফেসর বললেন—"পেছনে দুটো ফুটো আছে—নিশ্চয় কান। কান আর চোখ নিশ্চয় কারো ধড়ে লাগানো থাকে না—ব্রেনের লাগোয়া হয়। তাহলে পুরো থলথলে বস্তুটাই কি ব্রেন নয়?"

ঢোঁক গিলল ওয়াটসন। যুক্তি অকাট্য। নির্বাক থাকাই শ্রেয়।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, টিনের বাক্সে হাত দিয়ে বললেন—"ডাক্তার, কৃস্ট্যালটা তোমার দেখা দরকার। পৃথিবীতে এমন জিনিস আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারেনি—আবিষ্কার করা তো দূরের কথা: টেলিগ্রাফ যন্ত্রে যেমন তারের মধ্যে দিয়ে লেখা ছুটে যায়, টেলিফোনে যেমন তারের মধ্যে দিয়ে খবর ছুটে যায়, এই কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে ইথারের মধ্যে দিয়ে ছবি ভেসে যায়। বলতে পারো গ্রহে গ্রহে যোগাযোগের টেলিভিশন।"

"কৃস্ট্যালাভিশন।" টিপ্পনী কাটল শার্লক হোম্‌স্‌।

"হোম্‌স্‌," এতক্ষণে যেন হোমসের কথা মনে পড়ল চ্যালেঞ্জারের, "কৃস্ট্যাল এবার বের করবো, মক্কেলকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসব—তারপর হারামজাদাকে আস্ত ধরবার কি প্ল্যান তুমি এঁটেছো বলো।"

বড়। অনুজ্জ্বল নীলাভ দীপ্তি কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ভেতরে। কালো কাপড় দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে হোম্‌স্‌কে ডাকলেন প্রফেসর। ওয়াটসনও কৃস্ট্যাল দৃশ্য দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে মাথা গলালো কালো কাপড়ের তলদেশে। অমনি দেখল নীলাভ কুয়াশা সরে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই দেখাতে পারি। তারপর একটা জ্যান্ত মানুষকেও.....

উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাণ্টলপিস থেকে মরক্কো চামড়ার ব্যাগ বার করল হোমস্‌। বার করল সিরিঞ্জ আর মরফিনের শিশি।

"হোম্‌স্‌," আঁৎকে উঠল ওয়াটসন—"বারো বছর ছেড়ে দেওয়ার পর আবার?"

ধীর কণ্ঠে হোম্‌স্‌ শুধু বললে—"আমার জন্যে নয়, ওয়াটসন। মানুষের রক্ত যারা নিজেদের রক্তে মিশোয়, তাদের রক্তে এই মাদক দ্রব্যটি মিশিয়ে দেখতে চাই মানুষের মতই ঝিমিয়ে পড়ে কিনা।"

"হোম্‌স্‌!" সটান উঠে দাঁড়াল ওয়াটসন।

চ্যালেঞ্জার ততক্ষণে বাক্সর ঢাকনি খুলে কৃস্ট্যাল বার করে ফেলেছেন। ডিমের মত গড়ন, কিন্তু মুঠির মত সহসা স্পষ্ট দেখা গেল দুটো ড্যাবডেবে চোখ নিষ্পলকে চেয়ে আছে। আশপাশে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

বিড় বিড় করে বললেন প্রফেসর—"চললাম মেশিনের কণ্ট্রোল রুমে। এই কৃস্ট্যালের জুড়ি কৃস্ট্যাল নিয়ে বসে আছে শয়তান। জুড়ির খোঁজে টহল দিচ্ছে। এল বলে এক্ষুনি।"

বলতে না বলতেই অন্ধকার হয়ে গেল কৃস্ট্যাল। কালো কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রফেসরও উঠে দাঁড়ালেন তক্ষুনি। ঢাকনি খোলা বাক্সের মধ্যে কৃস্ট্যাল রেখে বাক্স রাখলেন খোলা জানলার সামনে টুলের ওপর।

বললেন হৃষ্ট কণ্ঠে—"শুধু ঢাকনিটা খোলা রইল—তার মানে ঘরের কড়িকাঠটুকুই কেবল দেখতে পাবে

ভিনগ্রহী—আমাদের নয়। ডাক্তার, তুমি বড্ড ভয় পেয়েছো—ঘরের ঐ কোণে দাঁড়াও। হোমস্, তুমি সিরিঞ্জ নিয়ে জানলার এপাশে দাঁড়াও। আমি দাঁড়াচ্ছি ওপাশে।"

কথা শেষ হতে না হতেই ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ শোনা গেল অনেক দূরে। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুত ছন্দে নয়—অনেকটা ধীর গতিতে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হোমস্ বললে—"এসে গেছে।"

রাস্তার মোড়ে দেখা গেল একটা ফাইটিং মেশিনকে। প্রতি পদক্ষেপে ভক্ ভক্ করে সবুজ বাষ্প ঠিকরে বেরোচ্ছে সন্ধির জায়গাগুলো দিয়ে। বয়লার বপুর চারপাশ দিয়ে ঠিকরোচ্ছে সবুজ বাষ্প। তিনটে পা ফেলে অদ্ভুত বিকট কায়দায় এগিয়ে আসছে বেকার স্ট্রীট দিয়ে।

জানলার সামনে এসে গেছে মেশিন। হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে রাস্তার ওপর। লক্ষ ভোমরার ডাকের মত আশ্চর্য একটা গুনগুন গুনগুন আওয়াজে কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছে। জুনের ঝকঝকে রোদ ঢাকা পড়ে গেল সহসা। জানলা জুড়ে বয়লার বপু হেলান দিয়ে রয়েছে দেওয়ালে। খটাং খট শব্দে কি যেন খুলে গেল।

জানলার গোবরাটে সপাং করে আছড়ে পড়ল একটা শুঁড়। তারপর আর একটা। ধাতুর তৈরী শুঁড় নয়—প্রাণীদেহের শুঁড়। সেইসঙ্গে শোনা গেল হাপরের মত শব্দে নিঃশ্বাস নেওয়ার কষ্টকর শব্দ! হু-উ-উ-স হু-উ-উ-স শব্দে আওয়াজ করতে করতে আরো দুটো শুঁড় এসে পড়ল গোবরাটে। তারপর পিছলে এল একটা থলথলে চামড়ার দেহ। গোবরাট পেরোতে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। শুঁড় দিয়ে অনেক কসরৎ করে ভারী দেহটাকে

একজোড়া শুঁড় পাকসাট দিয়ে বসে গেল প্রফেসারের গলার উপর।

সরে এল হোমস্। ফাইটিং মেশিনের চলন ভঙ্গিমায় সেই তেজ আর নেই। পুরো যন্ত্রটাই যেন নিস্তেজ নির্বীর্য।

নিয়ে এল গোবরাটের ওপর। তারপর ধপাস করে পড়ল ঘরের মেঝেতে। আয়তনে ঠিক যেন বড় ভালুক।

চক্ষের নিমেষে চ্যালেঞ্জার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার

ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় কালচে একজোড়া গোল চোখ ফিরল প্রফেসরের পানে ; একজোড়া শুঁড় পাকসাট দিয়ে বসে গেল গলার ওপর।

দম আটকে গেল চ্যালেঞ্জারের। গরিলা শক্তি নিয়েও নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না শুঁড়েদের পাকসাট থেকে। ঠেলে বেরিয়ে এল দুই চোখ। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"হোম্‌স্‌···কুইক!"

হোম্‌স্‌ তার আগেই অবশ্য ধেয়ে এসেছে। আগন্তুকের দুই চোখ চ্যালেঞ্জারের ওপর নিবদ্ধ থাকায় দেখতে পায়নি হোমসকে। চক্ষের নিমেষে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল ড্যাবডেবে দু'চোখের ঠিক নিচে থলথলে চামড়ায়। শূন্য সিরিঞ্জ শিশিতে ডুবিয়ে ভর্তি করে নিয়ে আবার ফুঁড়ে দিল একই জায়গায়।

থরথর করে কেঁপে উঠল আগন্তুকের প্রত্যঙ্গগুলো। তারপর একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ল চ্যালেঞ্জারের কণ্ঠদেশ থেকে। হাপরের আওয়াজের মত নিঃশ্বাসের শব্দটাও এল কমে। মৃদু ছন্দে স্পন্দিত হতে লাগল থলথলে কলেবর।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রফেসর বললেন—"ধন্যবাদ, হোম্‌স্‌।"

ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে ওয়াটসন বললে—"পচা গন্ধটা কিসের, হোমস্‌?"

"এর গা থেকে বেরোচ্ছে। চামড়ায় পচন ধরেছে।" বললে হোমস্‌।

এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ওয়াটসন। ডাক্তারী চোখে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর বললে—"মর্ফিন দিয়ে তুমি ওর যন্ত্রণা কমিয়ে দিলে। বেচারা! মরতে বসেছিল, একেবারে মেরেই ফেললে। ঐ দ্যাখো, ফুসফুস আর কাজ করছে না।"

"বেচারা!" ছাদ কাঁপিয়ে হুংকার ছাড়লেন চ্যালেঞ্জার। "কাকে বেচারা বলছেন? মানুষের শরীরে জীবাণু আছে—আকাশে বাতাসে জলেও আছে। মানুষ সেই জীবাণু শত্রুকেই বন্ধু করে নিয়ে ঘর সংসার করে এসেছে এই পৃথিবীতে। সেই মানুষের রক্তই এই শয়তান পান করেছে। ওকে বেচারা বলছো?"

হোমস্‌ বললে—চ্যালেঞ্জার ঠিকই বলেছেন, ওয়াটসন। নররক্ত অতিশয় সুস্বাদু ওদের কাছে। তাই নির্বিচারে মানুষ বধ করেছে। কিন্তু মানুষের দেহে বাসা বাঁধা জীবাণুরা অদৃশ্য বলেই যে নিরীহ, তা তো নয়। ওরা যে সব গ্রহে বিজয় কেতন উড়িয়ে এসেছে, অদৃশ্য জীবাণুরা নিশ্চয় এইভাবে সে সব গ্রহ পাহারা দেয় না। তাই পার পেয়ে গেছে। তাই ঘায়েল হল সবুজ সুন্দর, এই পৃথিবীতে এসে;"

চ্যালেঞ্জার বললেন—বস্তিমে পরে দিও, হোমস্‌। লাশটাকে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে জিইয়ে রাখা দরকার গবেষণার খাতিরে। বড় চৌবাচ্চা আছে বাড়ীতে?

"আছে, আর দোকানে দোকানে আছে অনেক মদ। ওয়াটসন হাত লাগাও। লাশটাকে নিচে নিয়ে যাওয়া যাক।"

এইচ. জি. ওয়েলসের লেখা "ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস" যারা পড়েছো, এর পরের ঘটনা তারা জানো। কিন্তু যে কাহিনী ওয়েল্‌স্‌ সাহেব লিখে যাননি—তাই নিয়েই এই চমকপ্রদ কাহিনী শেষ করছি।

লাশটাকে হেঁইও হেঁইও করে তিনজনে নামিয়ে নিয়ে গেল এক তলায়, ন ফুট লম্বা, চারফুট চওড়া আর তিনফুট গভীর একটা শুকনো চৌবাচ্চা ছিল সেখানে। দড়ি দিয়ে বেঁধে গুরুভার লাশটাকে টেনে সেই চৌবাচ্চায় ফেলার পর, হাঁপাতে হাঁপাতে চ্যালেঞ্জার বললেন—"কী! বলেছিলাম না মঙ্গলের জীব এরা নয়? ফুসফুসটা নিঃশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ শুনেই বুঝেছিলাম—অতবড় ফুসফুস মঙ্গলের পাতলা হাওয়ার উপযুক্ত নয়। এ প্রাণী এমন কোনো গ্রহের যেখানকার মাধ্যাকর্ষণ বেশী তাই যেমন ওজন, তেমনি জোর। মরবার সময়েও ব্যাটাছেলে টুঁটি জড়িয়ে ধরে হাড়েহাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।"

হোমস্‌ বললে—"বুঝেছি। এবার দরকার মদ। চলুন, রাস্তার দোকান থেকে নিয়ে আসি।"

বেকার স্ট্রীটেই মদের দোকান ছিল। কয়েক পিপে মদ গড়িয়ে এনে ঢেলে দেওয়া হল চৌবাচ্চায়। তারপর হাত মুছে প্রফেসর উঠে এলেন দোতলায়। খোলা জানলা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ফাইটিং মেশিনের খোলা হ্যাচের মধ্যে দিয়ে ঢুকলেন ভেতরে। ওয়াটসন আর হোমস্‌ বাইরে দাঁড়িয়েই দেখল ভেতরকার রাশিরাশি সূক্ষ্ম কলকব্জা। প্রফেসর অনেকক্ষণ এটা ওটা নাড়াচাড়া করার পর একটি মাত্র জিনিস হাতে ঝুলিয়ে এলেন বাইরে।

জিনিসটা একটা ডিম্বাকৃতি ক্রুস্ট্যাল—অবিকল আগেরটার মতই, শুধু যা একটা ধাতব বাক্সের খুপরিতে বসানো এবং অনেকগুলো তার ঝুলছে বাক্সটার চারদিক থেকে।

জানলার গোবরাট টপকে ধপাস্‌ করে ঘরে লাফিয়ে পড়ে দন্ত বিকশিত করলেন প্রফেসর—"এই বস্তুটাই খুঁজেছিলাম।"

"এ তো দেখছি আমাদের ক্রুস্ট্যালের দোসর।"

বললে শার্লক হোমস্।

"হ্যাঁ, কিন্তু এই তারগুলো দিয়ে অন্যান্য জায়গায় রাখা কৃস্ট্যালের ছবিও দেখা যায়।"

"তার মানে মঙ্গলে এদের ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে এখন?"

ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল হানাদারদের দাপানি। লণ্ডনের পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখা গেল কুপোকাৎ মেশিনদার। পৃথিবী বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল যাদের-শুধু-চোখে-দেখা-যায়-না—সেই অদৃশ্য রক্ষী জীবাণু-দের পাল্টা আক্রমণে।

চলুন, রাস্তার দোকান থেকে.....

"হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো আনলাম।"

পৃথিবী আক্রমণের দশম দিনেই হানাদারদের আজব কৃস্ট্যাল-ভিশন আবিষ্কৃত হল এইভাবে। বিভিন্ন তারের যোগাযোগ ঘটিয়ে সেই কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে হানাদারদের অনেক ঘাঁটির দৃশ্য দেখলেন, প্রফেসর, হোমস্ এবং ওয়াটসন। দেখলেন, প্রিমরোজ ছিলেন বিরাট গর্তে। দলে দলে হানাদার ধুঁকছে রোগযন্ত্রণায়—মুমূর্ষু প্রকৃতই। যন্ত্রপাতিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। ওঁদের সামনেই হঠাৎ আকাশ থেকে গোঁৎ খেয়ে বিশাল উড়ন চাকতিটা ঠিকরে পড়ল গর্তের মধ্যে—চালক নিশ্চয় খতম হয়েছে। একতাল সবুজ ধোঁয়া ঠিকরে গেল চাকতির চারদিক থেকে।

মঙ্গলের ঘাঁটিতে বসে হানাদাররা সে খবর পেয়েছিল আগেই। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়ে গেল কিন্তু বিচ্ছিন্ন হল না। তারা এসেছিল অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে; উচিত শিক্ষা পেয়ে সে চেষ্টার ধার দিয়েও গেল না। বরং ভয় করতে শিখল পৃথিবীকে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল পৃথিবীর একটি মস্তিষ্ককে।

নাম, তাঁর প্রফেসর জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। কৃস্ট্যাল ভিশনের দৌলতে ধীমান জীবদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ নেগায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ও'র। ফলে ছবি-সংকেতের মধ্যে দিয়ে শুরু হল কথাবার্তা। ছবি-সংকেতের মধ্যে দিয়েই তারা বুঝিয়ে দিলে প্রফেসরকে, ধারণা তাঁর অভ্রান্ত। সত্যই তারা সৌর জগতের বাসিন্দা নয়—

এসেছে বহু দূরের আর এক নক্ষত্র লোক থেকে। গ্রহে গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করে জ্ঞান বিনিময়ই তাদের লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে পেয়েছিল অঢেল খাদ্য, পরে যখন তা প্রমাণিত হল বিষাক্ত—তখন আর পৃথিবীতে তারা পা দেবে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস জ্ঞান ভাণ্ডারের কিছু কিছু দান করে যাবে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। যাতে একদিন তিনি নিজেই মহাকাশ যান বানিয়ে উড়ে যেতে পারেন তাদের গ্রহে। নীল বিদ্যুতের মন্ত্রগুপ্তিও তারা শিখিয়ে দিয়েছিল প্রফেসরকে। ফাইটিং মেশিনের কণ্ট্রোল কেবিনেই পাওয়া গিয়েছিল মটর দানার মত ছোট্ট একটা ক্রিস্ট্যাল। নীল মোটেই নয়—রক্তবর্ণ, কিন্তু বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সেই ক্রিস্ট্যালের দিকে ছুটে গেলেই তা থেকে বেরিয়ে আসত প্রলয়ংকর তেজরাশি—যা রিফ্লেকটর দিয়ে ঘুরিয়ে নীল বিদ্যুতের আকারে ফেলা যায়। যে দিকে খুশী—যার স্পর্শমাত্র নদীবাষ্প হয়ে উড়ে যায়, জাহাজ-বাড়ী-জীবদেহ অঙ্গারে পরিণত হয়। নীল বিদ্যুৎকে সংহত করে ঠিকমত ফেলতে পারলে পরমাণুকে ভেঙে বিপুল শক্তি তার মধ্যে থেকে বার করে আনা যায়। এই শক্তির দৌলতেই গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ায় ওরা। মঙ্গল থেকেও এসেছে পৃথিবীতে, মঙ্গল ওদের অস্থায়ী আস্তানা। সমগ্র সৌর জগত পরিভ্রমণ করে একটি মাত্র ধীমান মস্তিষ্কের সন্ধান ওরা পেয়েছে। সেই মস্তিষ্কটিকেই ওরা দিয়ে যাচ্ছে প্রলয়ংকর পরমাণুর শক্তি নিংড়ে নেওয়ার গুপ্তবিদ্যে, আকাশ-যান নির্মাণের কৌশল এবং টেলিপ্যাথির গোপন রহস্য—যা আয়ত্ত করতে না পারা পর্যন্ত মানুষ ইতর প্রাণীর পর্যায়েই থেকে যাবে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার রক্তবর্ণ ক্রিস্ট্যালটিকে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছেন, কেউ তার হদিশ পাচ্ছে না। তবে ইদানীং একটা গুজব শোনা যাচ্ছে। চ্যালেঞ্জার আজ স্বর্গতঃ ঠিকই, কিন্তু তাঁর গুপ্তবিদ্যে নাকি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য বৈজ্ঞানিকদের হাতে চলে গিয়েছে। যে বৈজ্ঞানিকদের উনি বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই পৃথিবীধ্বংসী পারমাণবিক শক্তির উৎস জীবদ্দশায় ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাননি—সেই বৈজ্ঞানিকরাই নাকি পারমাণবিক শক্তির ফরমুলাটা হাত করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর। ফলে, অ্যাটম বোমা উড়িয়ে দিয়েছে হিরোশিমা ও নাগাসাকি। তেজস্ক্রিয়তার বিষে আজ পৃথিবীর জল বাতাস পর্যন্ত বিষিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনছে। এই সেই শক্তি যা সৌরজগতের বাইরে থেকে দান হিসাবে এসেছিল পৃথিবীতে। কে জানে, দানব পৃথিবী ধ্বংসেরই সুদূর পরিকল্পনা করেছিল কিনা আত্মহননের মধ্য দিয়ে। (শেষ)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার : ১৯০১-১৯১০

পদার্থ বিজ্ঞান

সাল	নাম	বিষয়
১৯০১	ভিলহেলম কনরাড রনট্‌গেন (জার্মান)	এক্স্ রশ্মি আবিষ্কার
১৯০২	পিটার জিমান (ডাচ্)	বিকিরণের উপর চৌম্বকের প্রভাব
	হেন্ড্রিক আনতুম লোরেঞ্জ (ডাচ্)	
১৯০৩	আঁতোন হেনরি বেকুয়েরেল (ফ্রান্স)	স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার
	পিয়েরে কুরি (ফ্রান্স)	তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা
	মেরী স্কনডোয়াস্কা কুরী (জন্ম পোলাণ্ড, ফ্রান্সের নাগরিক)	রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার
১৯০৪	জন উইলিয়াম স্ট্রুট (বৃটিশ)	গ্যাসের ঘনত্ব এবং আর্গন আবিষ্কার
১৯০৫	ফিলিপ লেনার্দ (জন্ম হাঙ্গেরী, জার্মান)	ক্যাথোড রশ্মির উপর গবেষণা
১৯০৬	স্যার জোসেফ জন টমসন (ব্রিটেন)	গ্যাসের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা
১৯০৭	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন (জন্ম জার্মানি, মার্কিন নাগরিক)	আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং বর্ণালীবীক্ষণ বিষয়ক যন্ত্র

সমরজিৎ করের "নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী" হইতে সঙ্কলিত

চোখের নজর আর চশমা

অমিতাভ সেন

চশমা কে আবিষ্কার করেন বলা মুস্কিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চশমার ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। চশমা আবিষ্কারক হিসাবে যাঁদের নাম করা হয় তাঁদের মধ্যে আছেন ইংরাজ পাদ্রী রোজার বেকন আলেক-সান্দ্রো ডেল্ স্পিনা। চশমা পরা মানুষের প্রথম ছবি (ফ্রেস্কো) আঁকেন টম্মাসো দা মোডেনা ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখা যায় ইতালিতে বেশ ভাল মতো চশমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। চশমার ব্যাপক প্রচলন শুরু হওয়ার সঙ্গে আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। ছোট ছোট হরফে ছাপা বই পড়তে গিয়ে অনেকে প্রথম তাঁদের দৃষ্টিশক্তির ত্রুটির কথা জানতে পারলেন। চশমা তৈরির প্রথম যুগে শুধু উত্তল লেন্স তৈরি হত। ফলে কাছের জিনিস দেখতে যাদের অসুবিধা হয় তারাই শুধু এর দ্বারা উপকৃত হতেন। যাঁদের মায়োপিয়া আছে, অর্থাৎ দূরের জিনিস দেখতে যাদের অসুবিধা হয় তাঁদের প্রয়োজন অবতল লেন্স। পোপ দশম লিও প্রথম অবতল লেন্স ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। ১৫১৭ সালে র‍্যাফেল-এর আঁকা একটি ছবিতে দেখা যায় পোপ দশম লিও-র হাতে একটি অবতল লেন্স রয়েছে।

প্রথম দিকে তামা, দস্তা বা কাঠ দিয়ে পুরু ও ভারী চশমার ফ্রেম তৈরী হত। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চশমার ফ্রেম তৈরী শুরু হয় চামড়া ও হাড় থেকে। এখন আমরা চশমার ফ্রেমের যেরকম চেহারা দেখি প্রথম সেইরকম ফ্রেম তৈরী শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কচ্ছপের খোল থেকে।

প্রথম দিকে চশমার লেন্সের জন্য সাধারণতঃ 'স্পেক-টাকেল ক্রাউন্' কাঁচ ব্যবহার করা হত যার প্রতিসরাঙ্ক ১.৫৩। পরবর্তী কালে ১.৭০ প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট উন্নত-তর কাঁচের ব্যবহার শুরু হয় যার দরুন একই শক্তির লেন্সের ওজন কমে যায়, আকৃতিও আরো পাতলা হয়। চশমার কাঁচ বা লেন্সের শক্তি ডাইঅপ্টার্ এককে বিচার করা হয়। লেন্সের ফোকাল্ লেঙ্থ্ যত কমে তার ডাইঅপ্টার মান তত বাড়ে।

বর্তমানে খুব ক্ষীণদৃষ্টি লোকেদের জন্য সুখবর এনেছেন একজন মার্কিন বিজ্ঞানী। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌমাছির চোখের অনুকরণে তৈরী একটি 'পুঞ্জাক্ষি' লেন্স বিশিষ্ট অতি শক্তিশালী চশমা। এই প্রসঙ্গে মৌমাছিদের চোখের কথাটাও বলে নিই। মৌমাছিদের দৃষ্টি খুব জোরালো। তীব্র ঘ্রাণশক্তি ও 'যৌগিক' চোখের সাহায্যে তারা ফুল থেকে মধু আহরণ করে। মানুষের মতো মৌমাছিরাও রঙ দেখতে পায়। তবে লাল রঙটা তারা নাকি চিনতে পারে না। তা না পারুক, ওরা আবার অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়, যা মানুষের অসাধ্য। সে যাই হোক মৌমাছিদের চোখের গঠন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এই যে নতুন চশমাটি বর্তমানে তৈরী করা হয়েছে এর সাহায্যে প্রায় অন্ধ লোকেরাও, এযাবৎকাল যাঁদের পক্ষে কিছুই দেখা সম্ভব হয়নি, তাঁরাও দেখতে পাবেন। ফিলাডেল্ফিয়ার 'পেন্সিল্ভেনিয়া কলেজ অফ অপটোমেট্রি'র ডক্টর উইলিয়াম পাইন্‌ব্রুম এই চশমাটি উদ্ভাবন করেছেন। চশমাটিতে প্রত্যেক চোখের জন্য তিনটি করে ক্ষুদ্রাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো আছে। যাঁদের চোখের দৃষ্টি সাধারণ দৃষ্টিশক্তির মাত্র ২ শতাংশ, তাঁরাও এটি ব্যবহার করে প্রায় সুস্থ দৃষ্টির মানুষের মতো পড়া-শোনা করতে পারবেন। এই চশমার সাহায্যে দূরের জিনিস দেখারও ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটবে।

ডক্টর উইলিয়াম পাইনব্রুম আবিষ্কৃত পুঞ্জাক্ষি।

৮/১এ-শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

আবিষ্কারের গল্প

স্বপ্ন থেকে আবিষ্কার

নন্দলাল মাইতি

অনেক সময় বিজ্ঞান ও গণিতে তুচ্ছ ঘটনা বা ছোট্ট একটি ভাব বা ধারণা থেকে মহৎ আবিষ্কার ঘটে থাকে। এসব আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের তেমন কোন আপাত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁরাও অনেক সময় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। তাই সৃজনশীল প্রতিভা যেন চিরদিনই রহস্যময়; এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বুঝে উঠা খুব মুশকিল। এখানে বিজ্ঞান ও গণিতের এমন কয়েকটি আবিষ্কারের কথা বলব যাদের আবিষ্কার অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

তোমরা সবাই বিখ্যাত গ্রীক গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের নাম শুনেছ। রাজা হীরণের সোনার মুকুটের খাদ কিভাবে তিনি নির্ণয় করেছিলেন, সে গল্প তো সবার জানা। দেখ তো, কি সামান্য ও তুচ্ছ ঘটনা থেকে কত বড় মহৎ আবিষ্কার তিনি করেছিলেন! স্কুলের বিজ্ঞান বই-এ তোমরা এই আবিষ্কার থেকে পাওয়া সূত্রটি সবাই পড়েছ,— সেই আর্কিমিডিসের সূত্রটি।

স্কুলের উঁচু ক্লাশে যারা পড় তারা সবাই "পর্যায় সারণী" সূত্রটি পড়েছ এবং সেই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফের নাম শুনেছ। মেণ্ডেলিফ কিভাবে এই সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন জান? তিনি স্রেফ স্বপ্ন দেখে এই সূত্রটি লাভ করেছিলেন। তাঁকে আর কিছু করতে হয়নি। পরের দিন কেবল তিনি সূত্রটি কাগজে লিখে ফেললেন আর দেখলেন মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী সারণীতে মৌলগুলি সাজালে তাদের ধর্মাবলী সহজে মনে রাখা যায়। রসায়নশাস্ত্রে কত বড় মহৎ আবিষ্কার সামান্য একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ঘটল বল তো!

বেঞ্জিন জৈব যৌগের সঙ্গে কার না পরিচয় আছে? কাটা-ছেঁড়া হলে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতেও ডেটল ও বেঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এক সময় এই যৌগের গঠনমূলক সঙ্কেত নির্ণয় করা সহজ ছিল না। এখন অবশ্য তোমরা সবাই জান এর আণবিক সঙ্কেত, C_6H_6। কিন্তু এই গঠনমূলক সঙ্কেত কে আবিষ্কার করেছিলেন? জার্মান বিজ্ঞানী কেকুল এই গঠনমূলক সঙ্কেত আবিষ্কার করেছিলেন। শুনে আশ্চর্য হবে সামান্য একটি ঘটনা থেকে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানী কেকুল অবশ্য অনেকদিন ধরে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারেননি। একদিন তিনি টেবিলে বসে একটি পাঠ্যপুস্তক লিখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মানসপটে এক ছবি ভেসে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন শূন্যে একটি সাপ তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। তারপর তিনি দেখতে পেলেন সাপটি তার লেজটি কামড়ে ধরে বেদম পাক খেতে লাগল। ব্যস্, কেকুল বেঞ্জিনের গঠন-মূলক সঙ্কেতের হদিশ পেয়ে গেলেন। এইভাবে বেঞ্জিনের গঠনমূলক সঙ্কেতের সংবৃত্তাকার রূপটি প্রতিষ্ঠিত হলো। কি তুচ্ছ ঘটনা, আর কত বড় আবিষ্কার!

স্বপ্ন দেখে গণিতে এক মহৎ ও যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন রেখে দেকার্তে। সেদিন ছিল 10ই নভেম্বর, 1619 খ্রীস্টাব্দ। দেকার্তে তখন সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। এই স্মরণীয় রাত্রে তিনি পরপর তিনটি স্বপ্ন দেখেন আর তাতেই তাঁর জীবনের মোড় ফিরে যায়; সৈনিকের জীবন ত্যাগ করে তিনি পরে দার্শনিক ও গণিতবিদ হন। স্বপ্ন তিনটি:

(১) এক অপকারী বাতাসে তিনি নিরাপদ আশ্রয় থেকে যেন উড়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় পড়লেন যেখানে বাতাস সব ক্ষমতা হারিয়ে স্থবির হয়ে গেল।

(২) এই স্বপ্নে তিনি দেখলেন ভয়ঙ্কর ঝড়। কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেখার ফলে ঝড়ে তাঁর কোন ক্ষতি হলো না।

(৩) শেষ স্বপ্নে দেখলেন তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন যার প্রথম লাইন "জীবনের কোন্ পথে আমি যাব?"

এই স্বপ্ন দেখার আঠারো বছর পরে তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায়। তোমরা যে "গ্রাফ" অঙ্কন করো, তার আবিষ্কারক দেকার্তে; x-অক্ষ, y-অক্ষ প্রভৃতি তিনি আবিষ্কার করেন, আর স্বপ্ন দেখেই তা সম্ভব হয়েছিল। জ্যামিতি ও বীজগণিত আর আলাদা আলাদা রইলো না,—একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক এইভাবে স্থাপিত হলো।

শুধু স্বপ্ন দেখে গণিতে এমন মহৎ আবিষ্কারের ঘটনা আর নাই। তবে ছোট ছোট ঘটনা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো কখনো কখনো বড় বড় আবিষ্কার সম্ভবপর করে তুলেছে। জর্জ বুলি এক বিখ্যাত ইংরাজ গণিতবিদ। যখন মাত্র তাঁর ষোলো সতেরো বছর বয়স, তখন মাঠ দিয়ে

চলার সময় হঠাৎ একটি ভাব বা ধারণা তাঁর মনে জেগে উঠে। পরে পরিণত বয়সে তিনি সেই ধারণাটি অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "চিন্তার সূত্র" রচনা করেন। গণিত, দর্শন ও বিজ্ঞানে এই গ্রন্থটির অপরিসীম প্রভাব। আর এই গ্রন্থটি অবলম্বন করেই "বুলিয়ান বীজগণিত" নামে এরকম অভিনব বীজগণিত গড়ে উঠেছে।

আঁরি পঁয়কারে ফ্রান্সের এক শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল গণিতবিদ। গণিতের নানা শাখায় তাঁর বিস্ময়কর দখল ছিল। তিনি একবার গণিতের একটি সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। কিন্তু অনেকদিন যাবৎ কোন সমাধান করতে পারেননি। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন। রোজই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, আর বিফল হয়ে রেখে দেন। একদিন অঘটন ঘটল। তিনি সাধারণত ব্লাক কফি খেতেন না। কিন্তু সেদিন ব্লাক কফিতে চুমুক দিতেই যেন অঘটন ঘটে গেল। হুড়মুড় করে রাশি রাশি সমাধান তাঁর মাথায় এসে গেল ; আর তিনি সারা রাত ধরে কেবল লিখে গেলেন। সকালে পড়ে দেখেন যে-গাণিতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, তার সব সমাধান হয়ে গেছে। এইভাবে কখনো রাজপথে চলার সময়, সমুদ্রের ধারে বেড়াবার সময় এবং বাসের পা-দানিতে পা দিতে গিয়ে টুকরো টুকরো ভাব তাঁর মনে আসত ; আর তা থেকে আবিষ্কার করে ফেলতেন।

এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় তুচ্ছ বলে, ক্ষুদ্র বলে, অবজ্ঞার বলে কিছু নাই। সব কিছু, তা সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক, সবার মধ্য থেকেই শেখার আছে,—চিন্তা-ভাবনা করার আছে। আমরা ত রাতদিন কত স্বপ্নই দেখি,—কিন্তু তার মানে বা অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করি না। আবার কত ছোট ছোট ভাব বা ধারণা মাঝে মাঝে মনে জেগে ওঠে, তা নিয়েও বিচার বিশ্লেষণ করি না। কিন্তু তা করার দরকার আছে। তাই কবি বলেছেন,—

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

পোঃ ঠাকুরাণীচক, হুগলী।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পর্যায়

মান : নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ৫০৲ দ্বিতীয় ৩০৲ তৃতীয় ২৫৲

বিষয়সূচী

বিরল প্রাণী ॥ শব্দ সংখ্যা ॥ ২৫০

ভৌগোলিক আবিষ্কার ॥ „ ৩০০

মহাকাশ গবেষণা ॥ শব্দ সংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

[তিন] প্রেরিত রচনার ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না ; পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ :—৩০শে জুন, ১৯৮২

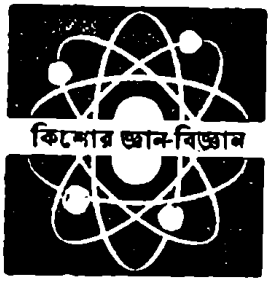

প্রতিযোগীর নাম :.....বয়স.....

ঠিকানা :.....

বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা :.....

শ্রেণী.....রচনার বিষয়.....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর.....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

সৌরজগৎ

বিমান বসু

রাত্তিরের আকাশে যদি চাঁদ না থাকে তবে কেমন দেখায় তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কালো কুচকুচে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য তারার মেলা। শহরের ধোঁয়াটে আকাশে অবশ্য অত তারা দেখতে পাওয়া কঠিন। তবে গ্রামাঞ্চলের স্বচ্ছ পরিবেশে রাতের আকাশ দেখে মনে হয় যেন হাজার হাজার হীরে বসানো গালচে।

সেই অসংখ্য তারার সবকটির ঔজ্জ্বল্য কিন্তু একরকম নয়। তাদের কোনটা খুব বেশী উজ্জ্বল আবার কোনটার আলো এত ক্ষীণ যে শুধু চোখে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। একটু লক্ষ্য করলে আরো একটা জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো আকাশের নানা জায়গায় গুটি কয়েক উজ্জ্বল তারা নিয়ে তৈরী নানারকম নক্সা। তাদের কোনটাকে দেখে মনে হয় জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত, কোনটা বা হাতে তীর ধনুক ধরা ব্যাধের মত, কোনটা দেখে মনে হয় যেন একটা সিংহ বসে আছে, আবার কোনটা দেখতে প্রকাণ্ড এক বিছের মত।

আকাশের ঐ সব কাল্পনিক নক্সাকেই আমরা বিভিন্ন রাশি বলে জানি। এই সব রাশিগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে বছরের পর বছর ধরেও এদের আকারে কোনও পরিবর্তন হয় না। মানে, সপ্তর্ষিমণ্ডলে বা কালপুরুষ রাশিতে যে সব তারা যে সব জায়গায় আজ দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে বহু বছর পরেও তাদের ঠিক সেই সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে।

কখনও কখনও রাতের আকাশে কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায় যেগুলি শুধু চোখে অবিকল তারার মত দেখায়। কিন্তু কিছুদিন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে সেগুলি তারার মত স্থির নয়। বরং ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। এই চলমান জ্যোতিষ্কগুলিই হল গ্রহ। রাতের আকাশে এদের অস্বাভাবিক আচরণ আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। আর এই বিভিন্ন আচরণের ভিত্তিতেই আধুনিক দূরবীন আবিষ্কারেরও বহুকাল আগে পাঁচটি গ্রহের পৃথক গতির বিষয় মানুষ জানতে পেরেছিল। তবে এ-ছাড়া গ্রহ সম্বন্ধে আর বেশী কিছুই তখন জানা ছিল না। সে সব জানতে পারা গিয়েছিল আরও অনেক পরে।

গ্রহ সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলার আগে এসো দেখা যাক গ্রহ কি আর তারা বা নক্ষত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য কি। শুধু চোখে দেখতে প্রায় এক রকম লাগলেও বস্তুতঃ গ্রহ এবং নক্ষত্র সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। নক্ষত্র হলো বিশাল গ্যাসীয় পিণ্ড যার উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রী। সে তুলনায় গ্রহের আকার খুবই ছোট এবং তাপমান মাত্রা কয়েক শ' ডিগ্রী। আমাদের সূর্য একটি মাঝারি সাইজের নক্ষত্র যার মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ম গ্যাস। এর ব্যাস হলো প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার। সে তুলনায় সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির ব্যাস হলো মাত্র ১৪ হাজার কিলোমিটার, মানে সূর্যের ব্যাসের মাত্র এক শতাংশ।

আয়তনের পার্থক্য ছাড়াও পৃথিবী থেকে গ্রহ এবং সূর্য বাদে যে কোনও নক্ষত্রের দূরত্বেও প্রচুর প্রভেদ আছে। পৃথিবী থেকে সৌরমণ্ডলের বাইরে নিকটতম নক্ষত্র হলো প্রক্সিমা সেণ্টাউরি যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৪১ লক্ষ কোটি (মানে ৪১-এর পরে বারোটা শূন্য) কিলোমিটারেরও বেশী। সে তুলনায় সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব পৃথিবী থেকে মাত্র ৬০০ কোটি কিলোমিটার।

গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য হলো এদের আলো বিকিরণের বেলায়। নক্ষত্র নিজেই দীপ্তিমান, কিন্তু গ্রহের নিজস্ব কোনও আলো নেই, সে দীপ্তিমান সূর্যের প্রতিফলিত আলোয়। সেজন্য নক্ষত্রের আলো স্পন্দনশীল কিন্তু গ্রহের আলো স্থির।

বহু বছরের পর্যবেক্ষণের পর আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে মানুষ প্রথম জানতে পারলো যে পৃথিবীসহ সবকটি গ্রহই সূর্যকে বিভিন্ন দূরত্বে প্রদক্ষিণ করছে (সে সময় অবশ্য পৃথিবী ছাড়া মাত্র পাঁচটি গ্রহের কথাই জানা ছিল)। এটাও জানতে পারা গেল যে বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহের পরিক্রমণের গতি ভিন্ন ভিন্ন। আর সেজন্যই রাতের আকাশে তাদের গতিপথ জটিল মনে হয়। কোপারনিকাস, টাইকোব্রাহি কেপলার, গ্যালিলিও প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলে আকাশে বিভিন্ন গ্রহের অস্বাভাবিক গতির রহস্য তো জানতে পারা গেল। কিন্তু গ্রহের আসল রূপ তখনও মানুষের কাছে অজানা। কেন অজানা তা তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ। শুধু চোখে রাতের আকাশে

গ্রহদের গতি ছাড়া বিশেষ কিছুই দেখা সম্ভব নয়, সুতরাং তাদের বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়াও অসম্ভব।

১৭শ শতাব্দীতে দূরবীন আবিষ্কারের পর এই বড় সমস্যাটাও দূর হলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন শুধু চোখে যা মাত্র আলোর বিন্দু বলে মনে

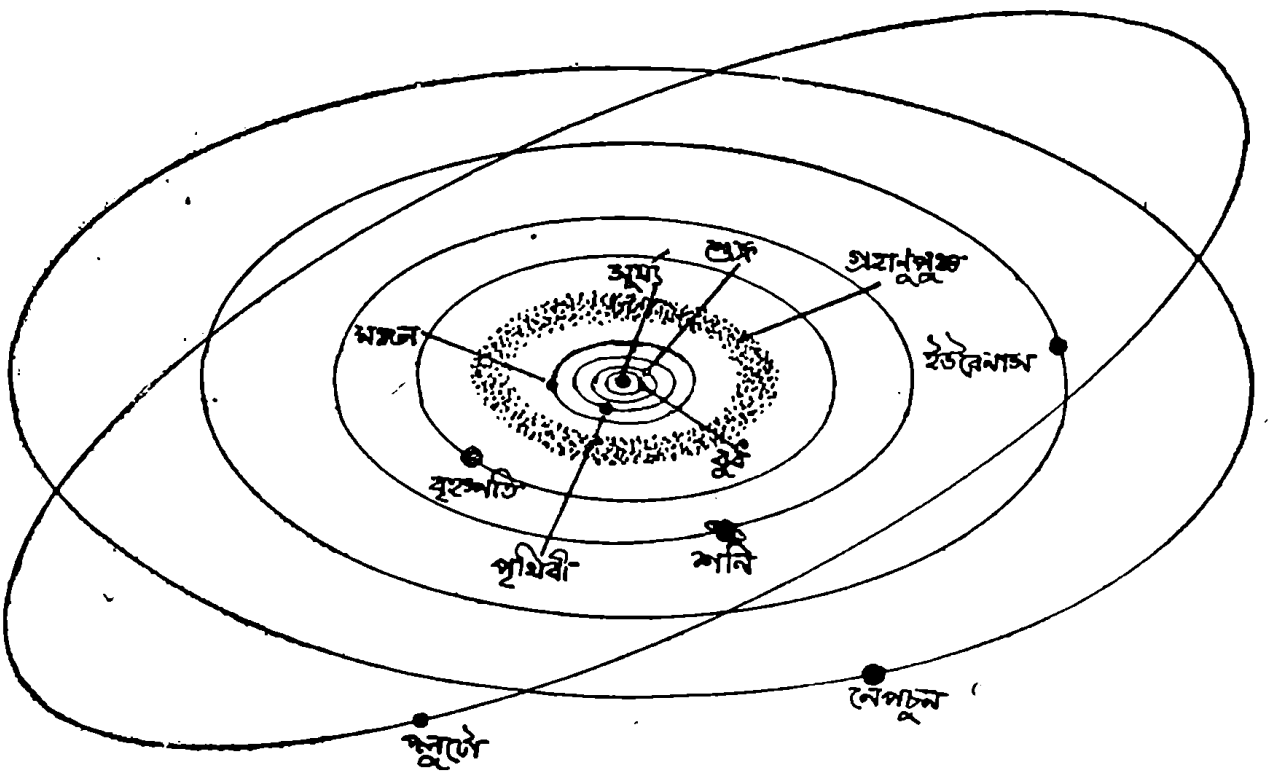

হয় দূরবীনে তা আর বিন্দু থাকে না। তাকে ছোট আলোর চাকতির মত দেখায়। সে সব চাকতি আকারে বড় ছোট, তাদের রং ভিন্ন। কারও গায়ে আবার ডোরা কাটা নক্সা আছে; কারও বেলায় দেখা গেল চাঁদের মত কলা যা নিয়মিত বাড়ে ও কমে। দূরবীনের আবিষ্কার যেন গ্রহজগতের অধ্যয়নে এক বন্ধ দ্বার খুলে দিল। পরবর্তীকালে দূরবীনের সাহায্যেই সৌরমণ্ডলের আরও তিনটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। সবে মিলে গ্রহের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো নয়।

সূর্য এবং নটি গ্রহ নিয়ে তৈরী আমাদের সৌরমণ্ডল। নটি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দূরত্বের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছে। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, খুবই ছোট গ্রহ, আয়তন পৃথিবীর মাত্র ছয় শতাংশ। বুধের পর শুক্র, আয়তনে পৃথিবীর জুড়ি। এর পর আছে আমাদের পৃথিবী, সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহ। পৃথিবীর পর মঙ্গল, আর একটি ছোট গ্রহ, আয়তন পৃথিবীর সাত ভাগের একভাগ। মঙ্গলের পর সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি, আয়তন পৃথিবীর একহাজার তিনশ' গুণেরও বেশী। তারপর আছে শনি, পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে সাতশ গুণ বড়। শনির পর আছে প্রায় একই সাইজের দুটি গ্রহ ইউরেনাস ও নেপচুন, আয়তন পৃথিবীর প্রায় ষাট গুণ। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ হলো প্লুটো, আয়তনে প্রায় বুধের মতই ছোট। এই নটি গ্রহ ছাড়াও আছে অসংখ্য ছোট বড় নানা সাইজের পাথরের টুকরো যাদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। এই গ্রহাণুপুঞ্জও অন্যান্য গ্রহদের মতই নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের আয়তনের তুলনায় তাদের মধ্যেকার দূরত্ব যে কি বিশাল তার আন্দাজ একটা সামান্য উদাহরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারবে। যদি আমরা ধরে নিই যে কলকাতার ইডেনের খেলার মাঠটা হলো আমাদের সৌরমণ্ডল তবে তার মাঝখানে আমাদের সূর্যের সাইজ হবে একটা ছোট পিং পং বলের মত। তার থেকে ৮০ সেন্টিমিটার দূরে থাকবে বুধ; ১·৪ মিটার দূরে শুক্র আর ঠিক ২ মিটার দূরে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীর

পর আরও ১ মিটার দূরে থাকবে মঙ্গল। আমাদের ইডেনের মাপকাঠিতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্ব হবে

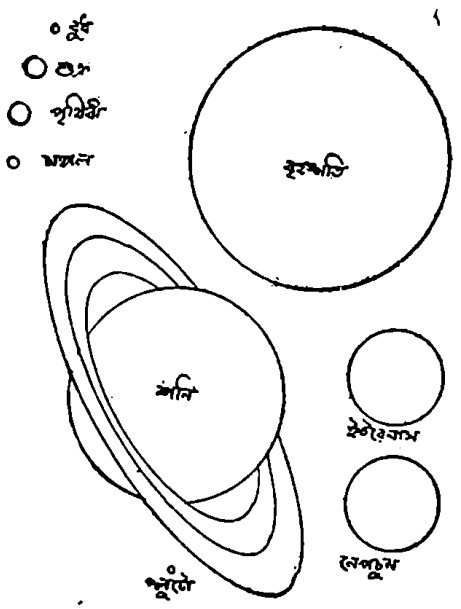

প্রায় ৭·৫ মিটার। তারপর আরও ৮·৬ মিটার দূরে থাকবে শনি। শনির পর ইউরেনাস থাকবে প্রায় ১৯ মিটার দূরে আর নেপচুন আরও ২২ মিটার দূরে। সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব আমাদের পিং পং বলের সাইজের সূর্য থেকে হবে প্রায় ৮০ মিটার, মানে সূর্য থেকে বুধের যা দূরত্ব তার ঠিক একশো গুণ।

এখানে একটা কথা বলা হয়নি। তা হলো, আমাদের ইডেনের সাইজের সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলির আয়তন কি দাঁড়াবে। সামান্য হিসেব করলেই দেখা যাবে যে এই স্কেলে শনি এবং বৃহস্পতি হবে ছোট বা মাঝারি সাইজের মটর দানার মত, ইউরেনাস ও নেপচুন সাগুদানার সাইজের। আর বাকি সব গ্রহের সাইজ হবে সরষে দানার চেয়েও ছোট।

দূরত্ব হিসেবে প্রতিটি গ্রহের আপন আপন কক্ষপথে পরিক্রমণের গতি ভিন্ন। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের সূর্যকে একবার পরিক্রমা করতে সময় লাগে আমাদের হিসেবে মাত্র ৮৮ দিন। মানে বুধের এক বছর পৃথিবীর ৮৮ দিনের সমান। শুক্রের পরিক্রমণের সময় লাগে প্রায় ২২৫ দিন, পৃথিবীর ৩৬৫ দিন, মঙ্গলগ্রহের ৬৮৭ দিন, বৃহস্পতির প্রায় ১২ বছর, শনির লাগে সাড়ে ২৯ বছর, ইউরেনাসের ৮৪ বছর, নেপচুনের ১৬৫ বছর আর প্লুটোর লাগে আমাদের পৃথিবীর হিসেবে প্রায় ২৪৮ বছর।

কেন এমন হয় সেটাও একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবে। একটা ঢিলে সুতো বেঁধে যদি সেটাকে মাথার উপর ঘোরাতে থাকো তবে দেখতে পাবে যে সুতোটা যদি লম্বা হয় তাহলে খুব আস্তে ঘোরালেও ঢিলটা ঠিক

সৌরমণ্ডল

গ্রহ	ব্যাস (কিলোমিটার)	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (লক্ষ কি.মি)	সূর্য প্রদক্ষিণ কাল	কক্ষপথে গতিবেগ (কি. মি. প্রতি সেকেণ্ড)	আয়তন (পৃথিবী = ১)	উপগ্রহ সংখ্যা
বুধ	৪,৮৪০	৫৭৯	৮৮ দিন	৪৭·১	০·০৬	০
শুক্র	১২,১০৪	১০৮২	২২৪·৭ দিন	৩৫	০·৮৮	০
পৃথিবী	১২,৭৫৬	১৪৯৬	৩৬৫·২৫ দিন	২৯·৮	১	১
মঙ্গল	৬,৭৮৭	২২৭৯	৬৮৭ দিন	২৪·১	০·১৫	২
বৃহস্পতি	১,৪২,৮০০	৭৭৮৩	১১·৮৬ বছর	১৩·১	১৩১৬	১৩
শনি	১,২০,০০০	১৪২৭০	২৯·৪৬ বছর	৯·৬	৭৫৫	২৩
ইউরেনাস	৫১,৮০০	২৮৬৯৬	৮৪ বছর	৬·৮	৬৭	৫
নেপচুন	৪৯,৫০০	৪৪৯৬৬	১৬৪·৮ বছর	৫·৪	৫৭	৪
প্লুটো	৬০০০	৫৯০০০	২৪৭·৭ বছর	৪·৭	০·১	১

ঘুরতে থাকবে, মাটিতে পরে যাবে না। কিন্তু সুতো যদি ছোট হয় তাহলে ঢিলটাকে গতিশীল অবস্থায় রাখবার জন্য সেটা অনেক বেশী জোরে ঘোরাতে হবে। সৌর-মণ্ডলের বেলায়ও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। তবে এখানে সুতোর টানের বদলে আছে সূর্যের অভিকর্ষ যা সবকটি গ্রহকে এক অদৃশ্য টানে বেঁধে রেখেছে।

আকার এবং দূরত্ব ছাড়াও গ্রহগুলির আরও একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। তা হলো এদের গঠনে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং প্লুটো—এদের গঠন হলো আমাদের পৃথিবীর মতই। পৃথিবীর মত এরাও মাটি পাথরের তৈরী। অপরদিকে বৃহস্পতি ও শনি হলো সম্পূর্ণ ভাবে বাষ্পীয় পদার্থের তৈরী। সেজন্য পৃথিবীর তুলনায় এদুটি গ্রহের ঘনত্ব অত্যন্ত কম, মানে আয়তনের অনুপাতে এদের ওজন খুবই অল্প। ইউরেনাস ও নেপচুনও বাষ্পীয় পদার্থের তৈরী, তবে সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার দরুন এরা এত ঠাণ্ডা যে দুটি গ্রহই বস্তুতঃ জমাট বাঁধা গ্যাসের বরফের তৈরী।

গ্রহ এবং গ্রহপুঞ্জ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে আছে গোটা পঞ্চাশেক ছোট বড় নানা সাইজের উপগ্রহ যা বিভিন্ন গ্রহের চারদিকে কক্ষপথে ঘুরছে। কেবল বুধ এবং শুক্রের কোনও উপগ্রহ নেই। অপরদিকে আবার একা শনির উপগ্রহের সংখ্যাই হলো ২৩। মানে সৌরমণ্ডলের মোট উপগ্রহের অর্দ্ধেকেরই মালিক হলো শনি। এছাড়া শনিগ্রহের আরও একটি বিশেষত্ব হলো তার সুন্দর বলয় সমূহ। আজ অবশ্য আমরা জানতে পেরেছি যে শনি ছাড়া আরও দুটি গ্রহ—বৃহস্পতি এবং ইউরেনাসেরও নিজস্ব বলয় আছে। তবে শনির বলয়ের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত পাতলা।

গত কয়েক দশকে মহাকাশ অভিযানের ফলে সৌর-মণ্ডলের গ্রহগুলির বিষয় আজ আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি যা এর আগে অজানা ছিল। গ্রহ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণাও ভেঙে গেছে। মানবরহিত মহাকাশ যানগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রহ থেকে যে সব ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়েছে সেগুলি অধ্যয়ন করে গ্রহ বিজ্ঞানীরা গ্রহের উৎপত্তি, গঠন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। সে সব কথাই এবার তোমাদের বলবো।

(ক্রমশঃ)

৭ ইউ, এফ, কলেজ রোড, নিউ দিল্লী ১

ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

* * * * * *

মার্কো পোলো (১২৫৬-১৩২৩): ইনি ছিলেন ভেনিস দেশীয় পরিব্রাজক ও দেশ আবিষ্কারক। ইউরোপীয়দের মধ্যে মার্কো পোলো সর্ব প্রথম চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ ভ্রমণ করেন। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে মধ্য এশিয়ার বহু জায়গার পরিচয় জানা যায়।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৪৭-১৫০৬): ইনি ছিলেন একজন ইতালি দেশীয় নাবিক। স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে স্পেন থেকে সমুদ্র যাত্রায় বের হন। প্রথমে বাহামা ও কিউবা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় বার সমুদ্রযাত্রায় ইনি ভারতবর্ষের সন্ধানে বেরিয়ে আমেরিকার কাছাকাছি কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

আমেরিগো ভেসপুচি (১৪৫১-১৫১২): ইনি জাতিতে ইতালিয়ান ছিলেন। ইনিও দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং কলম্বাসের পথ অনুসরণ করে দক্ষিণ-আমেরিকায় পৌঁছান। তাঁর আবিষ্কৃত দেশকে লোকে 'আমেরিগোর দেশ' বলে অভিহিত করে। সেই থেকে আমেরিকা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ভাস্কো ডা গামা (১৪৬০-১৫২৪): ইনি একজন পর্তুগাল দেশীয় নাবিক। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষ যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন।

[স্বপন বুড়োর 'বুক অব নলেজ' থেকে]

রসায়নের সহজ পাঠ

অমরনাথ রায়

জৈব যৌগের অ, আ, ক, খ শুরু হয়েছিল আগের অধ্যায়ে। ঐ অধ্যায়েই বলা হয়েছিল যে অজৈব যৌগের তুলনায় জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু কেন বেশী?—হ্যাঁ, সেইটাই এখন বলব।

কার্বন পরমাণুর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অনেকগুলি কার্বন পরমাণু নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল (Chain) গঠন করতে পারে। কার্বন পরমাণুর এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মের নাম ক্যাটেনেশন (Catenation)। এই ধর্মটির জন্যেই অসংখ্য জৈব যৌগের উৎপত্তি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো—দু'টি কার্বন পরমাণু কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়?—যুক্ত হয় তিন ভাবে।

(i) দু'টি কার্বন পরমাণু একটি যোজ্যতা বণ্ডের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুগুলির অন্যান্য যোজ্যতা বণ্ডগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে

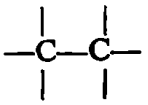

এইভাবে দু'টি কার্বন পরমাণুর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে এক বন্ধন (Single bond) দ্বারা যুক্ত হওয়া বলে। ইথেন (C_2H_6) অণুর কার্বন পরমাণু দুটি একটি মাত্র এক বন্ধনের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর অন্যান্য যোজ্যতা বণ্ডগুলি এক যোজী মৌল হাইড্রোজেনের এক একটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে 'ইথেন' এর গঠন সংকেত হয় এই রকম:

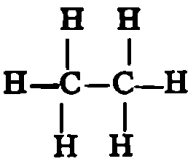

ইথেন (C_2H_6)

(ii) দু'টি কার্বন পরমাণু দুটি যোজ্যতা বণ্ড বা দ্বিবন্ধের (Double bond) দ্বারা যুক্ত হয়েও যৌগ গঠন করতে পারে। ইথিলিন অণুতে কার্বন পরমাণু দুটি পরস্পরের সঙ্গে দ্বি-বন্ধের দ্বারা যুক্ত। প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর অন্যান্য যোজ্যতা বণ্ডগুলি এক যোজী মৌল হাইড্রোজেনের এক একটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে 'ইথিলিন' অণুর গঠন সংকেত হয় এই রকম:

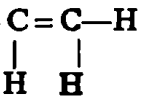

ইথিলিন (C_2H_4)

(iii) দু'টি কার্বন পরমাণু আবার পরস্পরের সঙ্গে একটি ত্রিবন্ধের (Triple bond) দ্বারা যুক্ত হয়েও যৌগ গঠন করতে পারে। 'অ্যাসিটিলিন' অণুতে এই রকম একটি ত্রি-বন্ধ দেখা যায়।

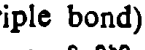

অ্যাসিটিলিন (C_2H_2)

॥ জৈব যৌগের প্রাথমিক শ্রেণী বিভাগ ॥

আগেই বলা হয়েছে যে বহু সংখ্যক কার্বন পরমাণু 'ক্যাটেনেশন' ধর্মের জন্যে পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে কার্বন শৃঙ্খল গঠন করে। এই কার্বন শৃঙ্খল আবার দু'রকম—মুক্ত শৃঙ্খল এবং বদ্ধ শৃঙ্খল।

মুক্ত শৃঙ্খল যৌগ:

মুক্ত শৃঙ্খল যৌগ দু'রকম। সরল শৃঙ্খল যৌগ এবং শাখাযুক্ত শৃঙ্খল যৌগ। সরল শৃঙ্খল যৌগে কার্বন শৃঙ্খল সরল রেখাকৃতি হয়। ঐ সরল রেখার দুই প্রান্তের কার্বন পরমাণু দু'টি পরস্পর যুক্ত থাকে না। 'প্রোপেন' (C_3H_8) একটি সরল শৃঙ্খল যৌগ। প্রোপেন এর গঠন সংকেত এই রকম:—

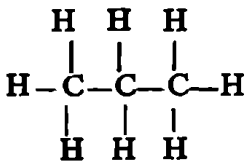

প্রোপেন (C_3H_8)

মিথেন, ইথেন ইত্যাদিও সরল শৃঙ্খল যৌগ।

যে সব মুক্ত শৃঙ্খল যৌগে কার্বনের সারি শাখা বিশিষ্ট হয়, তাদের বলা হয় শাখাযুক্ত শৃঙ্খল যৌগ। আইসো-বিউটেন শাখাযুক্ত শৃঙ্খল যৌগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

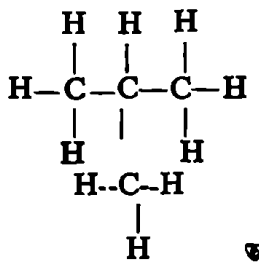

আইসো বিউটেন

নিয়ো পেনটেন, আইসো বিউটাইল অ্যালকোহল ইত্যাদিও শাখাযুক্ত শৃঙ্খল যৌগ।

মুক্ত শৃঙ্খল যৌগগুলিকে অ্যালিফ্যাটিক যৌগও বলা হয়।

বন্ধ শৃঙ্খল যৌগ :

কখনও কখনও তিন বা তার বেশী নির্দিষ্ট সংখ্যক কার্বন পরমাণুর মুক্ত শৃঙ্খলের দুই প্রান্তের কার্বন পরমাণু দু'টি পরস্পর যুক্ত হ'য়ে বৃত্তাকার সারি (Closed chain) গঠন করে। এই রকম কাঠামোযুক্ত যৌগগুলিকে বৃত্তাকার যৌগ বা বন্ধ শৃঙ্খল যৌগ বলে। এই রকম যৌগের পাশাপাশি দু'টি কার্বন পরমাণুর মধ্যে এক সমযোজী এবং দ্বিযোজী বন্ধন বা বণ্ড থাকতে পারে।

সে যাই হোক্, বন্ধ শৃঙ্খল বা বৃত্তাকার যৌগ আবার তিন শ্রেণীর হয়—(i) অ্যারোমেটিক (ii) অ্যালিসাইক্লিক এবং (iii) হেটেরোসাইক্লিক।

বেঞ্জিন (C_6H_6) হলো সরলতম এবং আদি অ্যারোমেটিক যৌগ। এই শ্রেণীর যৌগের মধ্যে ছয়টি কার্বন পরমাণু একযোজী এবং দ্বিযোজী বন্ধনের সাহায্যে বন্ধ শৃঙ্খল ষড়ভূজ গঠন করে। একে 'বেঞ্জিন রিং' বলে।

যে সব জৈব যৌগের মধ্যে এ রকম বেঞ্জিন রিং থাকে, তারাই হলো অ্যারোমেটিক যৌগ।

ল্যাটিন ভাষায় 'অ্যারোমা' শব্দের অর্থ সুগন্ধ। সুগন্ধের জন্যেই এই শ্রেণীর যৌগকে অ্যারোমেটিক বলা হয়। বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতি যৌগ অ্যারোমেটিক শ্রেণীর। নীচে বেঞ্জিন অণুর গঠন সংকেত দেওয়া হলো।

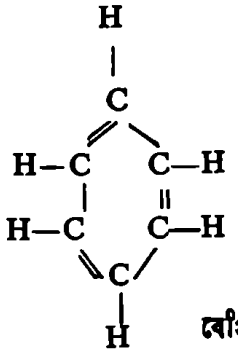

বেঞ্জিন অণু

বৃত্তাকার বা বন্ধ শৃঙ্খল যে সব জৈব যৌগে বেঞ্জিন কাঠামো দেখা যায় না, তাদের অ্যালিসাইক্লিক যৌগ বলে।

সাইক্লো প্রোপেন, সাইক্লো পেনটেন, সাইক্লো বিউটেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর জৈব যৌগ। এই সব যৌগের ধর্ম ও প্রকৃতি অ্যালিফ্যাটিক বা মুক্ত শৃঙ্খল যৌগের মত বলে এদের এইরকম নামকরণ হয়েছে। নীচে সাইক্লোবিউটেন-এর অণুর গঠন সংকেত দেওয়া হলো।

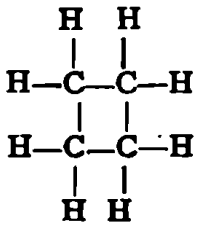

সাইক্লো বিউটেন অণু

অনেক সময় বৃত্তাকার সারি গঠনে কার্বন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন, সালফার এবং নাইট্রোজেন পরমাণুও অংশগ্রহণ করে। এই জাতীয় যৌগের নাম 'হেটেরো-সাইক্লিক'।

থাইওফিন, পিরিডিন, ফিউরান প্রভৃতি হেটেরো-সাইক্লিক যৌগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নীচে 'থাইওফিন'-এর গঠন সংকেত দেওয়া হলো।

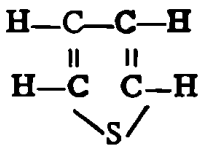

থাইওফিন অণু

জৈব মূলক ও কার্যকরী মূলক :

জৈব রসায়নে দু'রকম মূলকের অস্তিত্ব দেখা যায়—জৈব মূলক ও কার্যকরী মূলক।

যৌগ মূলক কাকে বলে এবং অজৈব যৌগের বিভিন্ন প্রকার যৌগ মূলকের পরিচয় আগের একটি অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে আসা যাক্ জৈব মূলকের কথায়।

জৈব মূলক বুঝতে গেলে আগে জানতে হবে 'হাইড্রোকার্বন' কাকে বলে। —কার্বন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত দ্বি-যৌগিক পদার্থকে বলা হয় 'হাইড্রোকার্বন'। মিথেন (CH_4), ইথিলীন (C_2H_4) অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) ইত্যাদি যৌগগুলি হাইড্রোকার্বন যৌগ।

কোন হাইড্রোকার্বন যৌগের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু চলে গেলে যে পরমাণুপুঞ্জ পড়ে থাকে, তাকেই বলে জৈব মূলক। জৈব মূলক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত থাকে এবং একটি পরমাণুর মত অংশ গ্রহণ করে।

জৈব মূলককে হাইড্রোকার্বন মূলকও বলা হয়। নীচে কয়েকটি জৈব মূলকের নাম এবং তার উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হলো।

হাইড্রোকার্বন	প্রতিস্থাপিত H পরমাণুর সংখ্যা	উৎপন্ন জৈব মূলক
মিথেন (CH_4)	1টি H পরমাণু	মিথাইল ($-CH_3$)
ইথেন (C_2H_6)	1টি H পরমাণু	ইথাইল ($-C_2H_5$)
প্রোপেন (C_3H_8)	1টি H পরমাণু	প্রোপাইল ($-C_3H_7$)
বিউটেন (C_4H_{10})	1টি H পরমাণু	বিউটাইল ($-C_4H_9$)
ইথিলিন (C_2H_4)	2টি H পরমাণু	$>CH_2$ (মিথিলিন)
বেঞ্জিন (C_6H_6)	1টি H পরমাণু	$-C_6H_5$ (অ্যারাইল)

অ্যালকিল ও অ্যারাইল মূলক :

সংপৃক্ত মুক্ত শৃঙ্খল হাইড্রোকার্বনের সাধারণ নাম 'অ্যালকেন'। এই অ্যালকেন থেকে উৎপন্ন জৈব মূলককে বলা হয় 'অ্যালকিল মূলক'। মিথাইল ($-CH_3$), ইথাইল ($-C_2H_5$) ইত্যাদি অ্যালকিল মূলক। অপর পক্ষে বৃত্তাকার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন থেকে উৎপন্ন মূলকের সাধারণ নাম 'অ্যারাইল'। ফিনাইল ($-C_6H_5$) অ্যারাইল মূলকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জৈব মূলকের পর কার্যকরী মূলকের কথায় আসা যাক। **যে সব মূলক জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে যৌগগুলির প্রকৃতি ও রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণ করে, সেই সব সক্রিয় মূলককে বলা হয় কার্যকরী মূলক।**

হাইড্রোকার্বনের অণু থেকে এক বা একের বেশী হাইড্রোজেন পরমাণু বিভিন্ন কার্যকরী মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েই বিভিন্ন জৈব যৌগ গঠন করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জৈব যৌগের ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এই কার্যকরী মূলক। নীচে কয়েকটি কার্যকরী মূলকের পরিচয় দেওয়া হলো।

কার্যকরী মূলক	কার্যকরী মূলকের সংকেত	জৈব যৌগের গোত্র
হাইড্রক্সিল	$-OH$	অ্যালকোহল
ইথার	$-O-$	ইথার
অ্যালডিহাইড	$-CHO$ বা $-C(=O)H$	অ্যালডিহাইড
কার্বনিল	$>CO$ বা $>C=O$	কিটোন
কার্বক্সিল	$-COOH$ বা $-C(=O)OH$	অ্যাসিড
অ্যামিনো	$-NH_2$ বা $-N(H)H$	অ্যামিনো
সায়ানো	$-CN$ বা $-C\equiv N$	সায়ানাইড বা নাইট্রাইল
কার্বো অ্যালকক্সিল	$-COOR$ বা $-C(=O)OR$ ($R = CH_3, C_2H_5$ ইত্যাদি।	এস্টার
নাইট্রো	$-NO_2$	নাইট্রো যৌগ

আদি যৌগ ও সঞ্জাত যৌগ :

মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ইত্যাদি হাইড্রোকার্বন যৌগ থেকে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অপর কোন অধিকতর ক্রিয়াশীল পরমাণু বা মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হ'য়ে অন্যান্য শ্রেণীর জৈব যৌগের উৎপত্তি ঘটায়। এক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বন যৌগকে আদি যৌগ এবং তা থেকে উৎপন্ন বা সৃষ্ট যৌগকে সঞ্জাত যৌগ বলে।

উদাহরণ : $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

(মিথেন) (মিথাইল ক্লোরাইড)

এক্ষেত্রে মিথেন হলো আদি যৌগ এবং মিথাইল ক্লোরাইড হলো সঞ্জাত যৌগ। মিথেনের আর দুটি সঞ্জাত যৌগ হলো মিথাইল অ্যালকোহল এবং মিথাইল অ্যামিন।

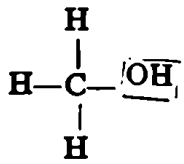
(মিথাইল অ্যালকোহল)

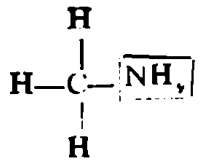
(মিথাইল অ্যামিন।)

সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন ঃ

যে হাইড্রোকার্বনে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে এক বন্ধন (single bond) দ্বারা যুক্ত থাকে এবং কার্বন পরমাণুগুলির অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন পরমাণুকে যুক্ত করে, সেই হাইড্রোকার্বনকে বলা হয় সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন।

উদাহরণ ঃ

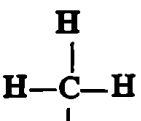
(মিথেন)

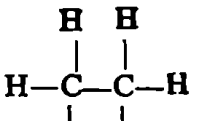
(ইথেন)

যে হাইড্রোকার্বনের অণুতে পরপর অবস্থিত দুটি কার্বন পরমাণু দ্বি-বন্ধ (double bond) বা ত্রি-বন্ধ (triple bond) দ্বারা যুক্ত থাকে এবং কার্বন পরমাণুগুলির অবশিষ্ট যোজ্যতা হাইড্রোজেন পরমাণুকে যুক্ত করে, সেই হাইড্রোকার্বনকে বলা হয় অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

যে সব অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে দ্বি-বন্ধ বর্তমান তাদের 'অ্যালকিন' বা 'অলিফিন' এবং ত্রি-বন্ধ বর্তমান তাদের 'অ্যালকাইন' বলা হয়।

উদাহরণ ঃ (ক) অ্যালকিন ঃ ইথিলিন ঃ

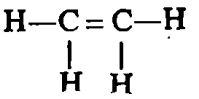

(খ) অ্যালকাইন ঃ অ্যাসিটিলিন ঃ $H-C\equiv C-H$

সমগণীয় সারি, সমগণ ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

একটি সাধারণ সংকেত এবং একই কার্যকরী মূলকযুক্ত এবং পরপর অবস্থিত যে কোন দুটি যৌগের আণবিক সংকেতে,—CH_2 এর পার্থক্য বিশিষ্ট একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন যৌগের শ্রেণীকে 'সমগণীয় সারি' বলে। আর একই সমগণীয় সারির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত যৌগকে 'সমগণ' (Homologues) বলে।

নীচে কয়েকটি সমগণীয় সারির উল্লেখ করা হলো।

'অ্যালকেন' বা প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন, সাধারণ সংকেত C_nH_{2n+2}

সংকেত	সাধারণ নাম
CH_4	মিথেন
C_2H_6 বা CH_3-CH_3	ইথেন
C_3H_8 বা $CH_3-CH_2-CH_3$	প্রোপেন
C_4H_{10} বা $CH_3-(CH_2)_2-CH_3$	বিউটেন
C_5H_{12} বা $CH_3-(CH_2)_3-CH_3$	পেনটেন
C_6H_{14} বা $CH_3-(CH_2)_4-CH_3$	হেক্সেন

'অ্যালকিন' বা অলিফিন, সাধারণ সংকেত C_nH_{2n}.

সংকেত	সাধারণ নাম
C_2H_4 বা $H_2C=CH_2$	ইথিলিন
C_3H_6 বা $H_2C=CH-CH_3$	প্রোপিলিন
C_4H_8 বা $H_2C=CH-CH_2-CH_3$	নরম্যাল বিউটিলিন
C_5H_{10} বা $H_2C=CH-CH_2-CH_2-CH_3$	নরম্যাল পেনটিলিন

অ্যালকোহল, সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}.OH$

সংকেত	সাধারণ নাম
CH_3OH	মিথাইল অ্যালকোহল
C_2H_5OH বা H_3C-CH_2-OH	ইথাইল অ্যালকোহল
C_3H_7OH বা $H_3C-(CH_2)_2-OH$	প্রোপাইল অ্যালকোহল
C_4H_9OH বা $H_3C-(CH_2)_3-OH$	বিউটাইল অ্যালকোহল

অ্যালডিহাইড, সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}\cdot CHO$

সংকেত	সাধারণ নাম
$H.CHO$	ফরম্যালডিহাইড
$CH_3.CHO$	অ্যাসিট্যালডিহাইড
$C_2H_5.CHO$ বা $CH_3.CH_2.CHO$	প্রোপিয়ন্যালডিহাইড
$C_3H_7.CHO$ বা $CH_3(CH_2)_2.CHO$	বিউটাইর্যালডিহাইড

কিটোন, সাধারণ সংকেত $\begin{matrix}R\diagdown\\R\diagup\end{matrix}C=O$; R অ্যালকিনমূলক

সংকেত	সাধারণ নাম
$CH_3.CO.CH_3$ বা $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	অ্যাসিটোন
$CH_3.CO.C_2H_5$ বা $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2CH_3$	মিথাইল ইথাইল কিটোন
$C_2H_5.CO.C_2H_5$ বা $CH_3CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-\underset{CH_3}{CH_2}$	ডাই ইথাইল কিটোন

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}\cdot COOH$

সংকেত	সাধারণ নাম
$H.COOH$	ফরমিক অ্যাসিড
$CH_3.COOH$	অ্যাসিটিক অ্যাসিড
$C_2H_5\ COOH$ বা $CH_3\ CH_2\ COOH$	প্রোপিয়নিক অ্যাসিড
$C_3H_7\ COOH$ বা $CH_3(CH_2)_2\ COOH$	বিউটাইরিক অ্যাসিড
$C_4H_9\ COOH$ বা $CH_3(CH_2)_3\ COOH$	ভ্যালেরিক অ্যাসিড

এস্টার, সাধারণ সংকেত, $R-\overset{O}{\overset{||}{C}}-OR$

(R = **অ্যালকিল মূলক।**)

সংকেত	সাধারণ নাম
$HCOO\ CH_3$ বা $H-\overset{O}{\overset{||}{C}}-OCH_3$	মিথাইল ফরমেট
$CH_3\ COOCH_3$ বা $CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-OCH_3$	মিথাইল অ্যাসিটেট
$C_2H_5\ COO\ CH_3$ বা $CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{||}{C}}-OCH_3$	মিথাইল প্রপিয়নেট

অ্যামিন্‌স, সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}.NH_2$

সংকেত	সাধারণ নাম
$CH_3\ NH_2$	মিথাইল অ্যামিন
$C_2H_5\ NH_2$ বা $CH_3\ CH_2\ NH_2$	ইথাইল অ্যামিন
$C_3H_7\ NH_2$ বা $CH_3.(CH_2)_2.NH_2$	প্রোপাইল অ্যামিন
$C_4H_9\ NH_2$ বা $CH_3\ (CH_2)_3\ NH_2$	বিউটাইল অ্যামিন

বিভিন্ন সমগণীয় সারির অন্তর্গত সমগণগুলির বৈশিষ্ট্য :

(i) একই সারির অন্তর্গত পরপর অবস্থিত যে কোন দুটি যৌগের অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যার পার্থক্য CH_2 হয়।

(ii) একটি সাধারণ সংকেতের দ্বারা একটি সারির অন্তর্ভূক্ত সমস্ত যৌগের আণবিক সংকেত প্রকাশ করা যায়।

(iii) একই সারির অন্তর্গত সমস্ত সমগণ একই মৌল দ্বারা গঠিত হয়।

(iv) কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত সকল সমগণের রাসায়নিক ধর্ম একই থাকে। আণবিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগণগুলির রাসায়নিক সক্রিয়তা কমে যায়।

(v) সমগণগুলির আণবিক গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘনত্ব, গলনাংক ও স্ফুটনাংক বাড়ে।

(vi) একই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনও নির্দিষ্ট সারির সমগণগুলি প্রস্তুত করা যায়।

(vii) প্রত্যেকটি সমগণীয় সারির অন্তর্গত প্রত্যেকটি সমগণে একই কার্যকরী মূলক থাকে। আর ঐ কার্যকরী মূলকের উপরই ঐ সারির অন্তর্গত সমগণগুলির সাধারণ রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. 'ক্যাটেনেশন' বলতে কি বোঝায় ?
2. বিউটেন এবং প্রোপিলিন অণুর আণবিক ও গঠন সংকেত লেখ।
3. প্রোপেন এবং আইসোবিউটেন, উভয়েই মুক্ত শৃঙ্খল যৌগ কিন্তু এই দুই যৌগের গঠনে পার্থক্য কোথায় ?
4. 'অ্যারোমেটিক যৌগ' কাদের বলে ? 'অ্যারোমেটিক' নামটি কিভাবে এসেছে ?
5. 'বেঞ্জিন রিং' বলতে কি বোঝ ?
6. অ্যালিসাইক্লিক ও হেটেরোসাইক্লিক যৌগের মধ্যে পার্থক্য কি ?

7. জৈব মূলক কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

8. অ্যালিফ্যাটিক যৌগ কাদের বলে ?

9. নিম্নলিখিত জৈব মূলকগুলির নাম লেখ ঃ

(i) $-C_2H_5$ (ii) $-C_4H_9$ (iii) $-C_3H_7$

10. 'কার্যকরী মূলক' বলতে কি বোঝ ? অ্যালকোহল এবং জৈব অ্যাসিডে যে যে কার্যকরী মূলক থাকে, তাদের নাম কি ?

11. নীচের কার্যকরী মূলকগুলি কোন্ কোন্ শ্রেণীর জৈব যৌগে থাকে ?

(i) $>C=O$ (ii) $-O-$ (iii) $-C\!\begin{smallmatrix}\nearrow O\\ \searrow OR\end{smallmatrix}$

12. 'আদি যৌগ' এবং 'সঞ্জাত যৌগ' কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

13. হাইড্রোকার্বন বলতে কি বোঝ ? কয়েকটি হাইড্রোকার্বন যৌগের নাম ও সংকেত লেখ।

14. অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন-এর মধ্যে পার্থক্য কি তা উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

15. সমগণীয় সারি ও সমগণ বলতে কি বোঝ ?

16. অ্যালডিহাইড ও অ্যামিন শ্রেণীর যৌগদের সমগণগুলির নাম ও সংকেত লেখ।

17. একই সারির অন্তর্গত সমগণগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

18. কার্বো অ্যালকক্সিল, কার্বক্সিল এবং হাইড্রক্সিল কার্যকরী মূলকযুক্ত জৈব যৌগের প্রত্যেকটির একটি ক'রে গঠন সংকেত লেখ।

19. অ্যারাইল মূলক কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

20. সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে কি বোঝ ?

21. সাইক্লোপেন্টেন এবং ফিউরান এর গঠন সংকেত লিখে বোঝাও যে প্রথমটি অ্যালিসাইক্লিক এবং দ্বিতীয়টি হেটেরোসাইক্লিক জৈব যৌগ।

[ক্রমশঃ]

ধাঁধা

সুনীত রায়

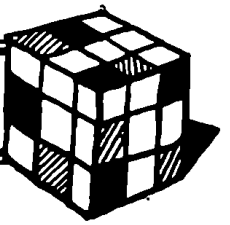

মেঘ না চাইতেই জলের মতো অরুণদা নিজে থেকেই বললেন, আজ আমি তোমাদের এমন একটা মজাদার ধাঁধা বলব, যা তোমরা আগে কখনো শোনো নি। তার আগে, শমীকের জন্মদিনের উপহারগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক! হঠাৎ শমীকের হাতে একটা নতুন সোনার আংটি দেখে, অরুণদা বললেন, আজকের ধাঁধাটা এই আংটিটাকে নিয়েই করা যাক। তার আগে, আমাদের আটজন মত ছেলেমেয়ে দরকার। মনে হয়, এটা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। শমীক, তুমি, ঐ আংটিটা হাতে খুলে যে কোন হাতের যে কোন আঙুলে এমনভাবে পর তোমার কোন বন্ধু, এমন কি আমিও টের না পাই, কোন হাতে তুমি ঐ আংটিটা পরেছ। শমীক বাইরে থেকে আংটিটা পরে অরুণদার সামনে আসতেই অরুণদা বললেন, ঐ দূরে তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা যেভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটা ফাঁকে ঠিক করে দাঁড়িয়ে পড়।

তোমাদের মধ্যে মনে হয় শ্রাবণীই চটপট হিসেব করতে পারে। শ্রাবণী খাতা পেনসিল, নিয়ে ঘরের ঐ কোণের চেয়ারটায় বস—আর আমি যা যোগ বলব, সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে করতে হবে। শমীক, তুমি শুধু শ্রাবণীকে বলে দাও, কোন হাতের কোন আঙুলের কোন পর্বে তুমি আংটিটা পরে আছ। কারণ, এটা শ্রাবণীর জানা দরকার। এবার তাহলে শুরু করা যাক। শ্রাবণী, শমীক ঐ সারিবদ্ধ লাইনের যে স্থানে বসে আছে তাকে ২ দিয়ে গুণ করে ৫ যোগ কর। যোগফলকে আবার ৫ দিয়ে গুণ করে ১০ যোগ কর। যোগফল যা হল তার সঙ্গে ডান হাতে আংটি পরলে ১ আর বাম হাতে আংটি পরলে ২ যোগ করতে হবে। বুড়ো আঙুল বা বৃদ্ধাঙ্গুলিকে ১ ধরে পরবর্তী আঙুলের সংখ্যা ১, ২, ৩, এভাবে ধরা হয়। এবার, ঐ যোগফলকে ১০ দিয়ে গুণ করে আঙুলের সংখ্যা দিয়ে যোগ কর। আবার, ঐ যোগ-ফলকে ১০ দিয়ে গুণ করে শমীক আঙুলের যে পর্বে আংটিটা পরেছে, সেই পর্ব সংখ্যা যোগ করে শেষ যোগ-ফল কত হল বল। শ্রাবণী যেই বলল ৬৭৫১, অমনি অরুণদা একটা ছোট্ট কাগজের ওপর উত্তরটা লিখে রেখে পকেটের মধ্যে ফেলে দিয়ে জিগ্যেস করল, তোমরা কি কেউ বলতে পারো—সারিবদ্ধ লাইনের কোন স্থানে (সেটা তো দেখাই যাচ্ছে), শমীকের ও কোন হাতের কোন আঙুলের কত সংখ্যক প.র্ব শমীকের সোনার আংটি অবস্থান করছে ?

দেখো না—নিজেরাই এর গুপ্ত কৌশল বের করতে পারো কিনা ?

৭০১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৩৪

বসন্ত বউরি পাখিদের কথা

অজয় হোম

কাঠকুট বর্গের (অর্ডার পাইকিফরমেস) অন্তর্গত পিঙ্গল বংশের (কাপিটোনিদি) পাখিদের চঞ্চু সুদৃঢ়, মোটা এবং ঈষৎ বাঁকা। উপরের চঞ্চুর আগা সূঁচাল এবং তলার চঞ্চু ছাপিয়ে ঈষৎ বার করা। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় লম্বা সরু খোঁচা খোঁচা গোঁফ কয়েকটি যেমন থাকে তেমনই থাকে চিবুক ও তলার চঞ্চুর সন্ধিস্থলে অনুরূপ কয়েকটি বেশ বড়ো খোঁচা দাড়ি। প্রাচ্যের প্রায় সব স্থানেই এই বংশের পাখির বসবাস। এমনকি দক্ষিণ আমেরিকাতেও এর নিকটতম দুই জ্ঞাতিকে দেখা যায়।

এই বংশে একটিমাত্র গণ পিঙ্গল (মেগালাইমা) এবং প্রজাতি ১০টি। তার মধ্যে ৪টিকে পশ্চিমবঙ্গের সমতলে দেখা যায়।

বসন্ত বউরি

গ্রীষ্মের ভরা দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।

রিষড়ার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে হাঁটা দিয়েছি রেল স্টেশনের দিকে। কোন কারণে বাস চলাচল বন্ধ।

পথ চলেছি। কয়েকটা আমগাছ ইতস্তত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলির দূরত্ব খুব বেশি না হলেও ঠিক আমবাগানও বলা যায় না। একটা গাছের তলা দিয়ে আসছি কানে এল সামনের গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে কে যেন একমনে ডেকে যাচ্ছে—'ত-গ-রু-ক্…ত-গ-রু-ক্…ত-গ-রু-ক্।'

সেই গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। দেখব পাখিটা কোথা থেকে ডাক দিচ্ছে। আমার আগমন টের পেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর আবার—'ত-গ-রু-ক্'…করে ডেকে চলল। আমি এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে থাকি। সেটা তার পছন্দ হল না, সবুজ কালো-নীল ও টুকটুকে লালের ছটা উড়িয়ে দূরের একটা গাছের ভিতর পাতার আড়ালে লুকাল। ওড়ার কায়দাটা কয়েকটা দ্রুত পাখার ঝাপট, একটু থামা একটু নামা, আবার পাখার ঝাপট।

পাখিটা পিঙ্গল বংশের এক প্রজাতি ; নাম—বসন্ত বউরি, বসন্তবৈরী, বসন্ত বুড়ী, বড়ো বসন্তবৈরী (মেগালাইমা এশিয়াটিকা)। হিন্দী—নীলকণ্ঠ্ বসনত্। ইংরেজি—ব্লুথ্রোটেড বারবেট।

বসন্ত বউরি

আমাদের দেশে পাখিদের নামের অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বসন্তের বৈরী বা শত্রু যে কিসে তা বুঝি না। বসন্তের বুড়ী, যাকে বলে 'দি ওল্ড ওম্যান অফ দি স্প্রিং' তাই বা কেন তারও মানে খুঁজে পাই না। বসন্ত বউরিরই বা অর্থ কি। এক হতে পারে বসন্ত বাউরা অর্থাৎ 'বসন্ত পাগল' এবং তারই অপভ্রংশ বসন্ত বউরি। বসন্তের আগমন বার্তা যে জানায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরস্বতী পুজোর সময় থেকেই এদের ডাকটা কানে আসতে শুরু করে।

বসন্ত বউরি লম্বায় ৯ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল মাথার চাঁদি ও ঘাড় টুকটুকে লাল; কপাল ও চাঁদির মাঝে আড়াআড়িভাবে সরু হলুদের এক টান। চোখের উপর দিয়ে একটা কালো পটি, মাথার লালের ধার ঘেঁষে পটিটার টান। বাকি উপরের সব পালক ঘাস-সবুজ। ডানার ওড়ার পালক কালচে-পাটকিলে। লেজের তলার শেষাংশ ফিকে নীল। মাথার দুপাশ, চিবুক গলা ও বুকের উপরাংশ এবং ঘাড়ের পাশ ফিকে সবজেটে-নীল। চঞ্চুর গোড়ার দুপাশে এবং ঘাড়ের দুপাশে দুটো লাল ফোঁটা এবং চঞ্চুর গোড়ার উপরে ও নিচে খোঁচা খোঁচা কালো লোম। বাকি তলার পালক হলদেটে-সবুজ। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের গোল পাতা কমলা। চঞ্চু মোটা ত্রিকোণাকার সবুজাভ-হলুদ, উপরটা কালচে। পা ময়লা সবুজ, নখর কালচে।

বাসস্থান—ভারত থেকে ইন্দোচীন হয়ে দক্ষিণ চীন, উত্তর বোর্নিও। ভারতে একটি উপজাতি (মে এ এশিয়াটিকা)—কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ৬ হাজার ফুটের ভিতর।

খাদ্য—নানা ধরনের ফলপাকুড়, তার মধ্যে বটপাকুড়ই প্রিয় এবং উড়ন্ত উই বা পিঁপড়ে।

স্বভাব—বসন্ত বউরি খুব ঘন জঙ্গলে বসবাস করে না। খেতখামার, মানুষের বসতির কাছে নানা ধরনের ফলপাকুড়ের গাছ যেখানে বেশি সেখানেই এদের দেখা যায়। গাছেই বাস করে, ভুলেও মাটিতে নামে না। গায়ের রঙ এমন যে ঘন পাতার আড়ালে বেশ মানিয়ে যায়, নজরে পড়ে না। কেবল ডাকই শোনা যায়, বিশেষত বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মে। সাঁওতালদের দেখেছি এদের মাংস পুড়িয়ে খেতে।

বসন্ত বউরি কখনও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না। প্রজননকাল মার্চ থেকে জুলাই। জ্ঞাতি কাঠঠোকরার মতোই ১০ থেকে ২৫ ফুটের মধ্যে গাছের কাণ্ডে বা কাণ্ডসংলগ্ন মোটা ডালে গর্ত করে বাসা বানায়। সাধারণত গর্তের সুবিধার জন্য গাছের ফাঁপা স্থানই বাছে। সবসময়ে অবশ্য ফাঁপা জায়গা পায় না। তখন গর্তের মুখ থেকে বাসা পর্যন্ত প্রায় একফুট লম্বা সুড়ঙ্গটা ত্রিকোণাকার মোটা চঞ্চুর আঘাতে বেশ নিপুণ ছুতোরের মতো অতি পরিপাটি করে খোঁড়ে। বাসা তৈরি করার একটা বিশেষত্ব দেখতে পাই যে এরা কখনও ডালের উপরের অংশে গর্ত করে না। বাসার প্রবেশপথ থাকে ডালের তলদেশে। বড়ো বড়ো গাছের মাঝারি ডালগুলোর নিচের দিকে যে ফুটো-গুলো আমাদের চোখে পড়ে তা সবই বসন্ত বউরির বাসা। বৃষ্টির জল যাতে বাসার মধ্যে না ঢোকে সেকারণেই এরা ডালের তলার দিকে কোটরে ঢোকার পথ তৈরী করে। অনেক সময় দেখা যায় একই কোটরে প্রতি বছর বাসা বাঁধতে। হয় তো কাঠখোদাইয়ের পরিশ্রম প্রতি বছর কে আর করে! ছানারা বড়ো হয়ে বাসা ত্যাগ করলেও বসন্ত-দম্পতি কোটর পরিত্যাগ করে না। ওখানেই রাত কাটায়।

গর্তের শেষে বাসায় সাধারণত আবর্জনাই বিছায়। কখনও দেখা যায় গাছের আঁশ, ঘাস বা অন্যান্য কিছু ডিমের তলায় দিতে। ডিম পাড়ে ৩-৪টি অমসৃণ সাদা রঙের। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ঘর সংসারের সব কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·০৯, চওড়ায় ০·৮০ ইঞ্চি।

সেকরাপাখি

মে মাসের দুপুর। কড়া রোদ। চারিদিক গরমে কেমন একটা যেন ঝিমঝিমভাব। আমাদের বরানগরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট অফিসের এক বিভাগ থেকে অপর বিভাগে চলেছি। হঠাৎ মাথার উপরে উঁচু একটা আমগাছের উপর থেকে আওয়াজ পেলাম—'ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্'। সেকরা হাতুড়ি ঠুকছে। গাছের উপর সেকরা? এদিক ওদিক তাকাই, কিছুই দেখতে পাই নে। তার উপর প্রচণ্ড রোদের ঝাঁঝ। তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না। আবার কানে সেকরার হাতুড়ির আওয়াজ এল। মনে হল, দুজন সেকরা একটা নেহাইয়ের উপর একজনের পর আর একজন ছোট হাতুড়ি ঠুকে চলেছে।

অনেক চেষ্টায় পাতার ফাঁকে একটা সবুজ ছোটো পাখি চোখে পড়ল। ঠুক্ ঠুক্ করে সেকরার হাতুড়ির আওয়াজ মুখ দিয়ে বার করছে আর মাথা দোলাচ্ছে বেশ একটা তালমানে। মাথাটা এদিক-ওদিক করাতে মনে হচ্ছে দুজন সেকরা বুঝি একটা নেহাইতে হাতুড়ি ঠুকছে। পাখিটা একেবারে পাকা 'ভেনট্রিলো কুইস্ট'। অদ্ভুত ধাতব শব্দ মুখে। কার সাধ্য বোঝে পাখি না সেকরা।...

পাখিটা পিপ্পল বংশের এক প্রজাতি; নাম—সেকরা-পাখি, ছোটো বসন্ত বউরি, ছোটো বসন্তবৌরী, ভগীরথ (মেগালাইমা হিমাকেফালা)। হিন্দী—ছোটা বসনত্। ইংরেজি—ক্রিমসনব্রেস্টেড বারবেট, কপারস্মিথ।

সেকরাপাখি লম্বায় সাড়ে ৬ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল ও বুক টুকটুকে লাল। চোখের দু'পাশ চিবুক ও গলা উজ্জ্বল হলুদ। নাকের গর্তের পাশ থেকে

চোখের উপর পর্যন্ত কালো একটা পটি, মোটা ঠিকোণাকার চঞ্চুর গোড়া থেকে গালের উপর দিয়ে ঘুরে মাথায় উঠে গেছে আর একটা কালো টান। চঞ্চুর গোড়ায় খুব সরু শক্ত খোঁচা লোম কয়েকটা খাড়া, আর কয়েকটা ঝুলে চঞ্চুর পাশ দিয়ে নিচে নেমেছে। ঘাড়ের পাশ ও পিঠ জলপাই-সবুজের উপর ধূসর ছাপ, অল্প কয়েকটা হলুদ টানও পিঠে। ওড়ার পালকের লুকানো অংশ কালচে। বুকে টুকটুকে লালের পরেই সোনালি হলুদের একটা পটি। এই পটির পর থেকে তলার পালক ফিকে হলুদ, তার উপর জলপাই-সবুজের সরু সরু টান। লেজ চৌকো, শেষপ্রান্ত সবুজাভ-নীল। কনীনিকা পিঙ্গল, চোখের পাতা ফিকে লাল। চঞ্চু কালো। পা প্রবাল-লাল, নখর কালো।

বাসস্থান—পাকিস্তান, ভারত, সিংহল, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া থেকে ইউনান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। একটি উপজাতি (মে হি ইণ্ডিকা)—পাঞ্জাব ও কচ্ছ (কচিৎ), নেপাল, বাংলাদেশ, সিংহল এবং সমগ্র ভারতে ৬ হাজার ফুটের ভিতর।

খাদ্য—নানাবিধ ফলপাকুড় ; মথ, ডানা-ওঠা পিঁপড়ে বা উই এবং অন্যান্য উড়ন্ত পোকা।

স্বভাব—বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোট্টা সেকরাপাখিকে চোখে দেখতে পাওয়ার চেয়ে ডাকের সঙ্গে পরিচয় হয় মানুষের অনেক বেশি। যেখানেই বড়ো বড়ো গাছ সেখানেই এদের আস্তানা। গাছ থেকে মাটিতে নামে না। এমনকি ছোটখাটো ঝোপেও নয়। সদা উচ্চে আসীন। ঘন পাতার আড়ালেই শয়নং ভোজনং ইত্যাদি।

সেকরাপাখি ওড়ে সোজাসুজি। ওড়ার সময় ডানার উত্থানপতন দ্রুত এবং তালে পড়ে। এক গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব খুব বেশি হলেও উড়তে আপত্তি নেই। ডাকটাই এদের অদ্ভুত ধাতব। গাছের উপর দিকে বসেই ডাকে। কখনও দেখেছি সরু ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে ডাকছে। সকালেও ডাকে কিন্তু দুপুরে যত গরম পড়ে এদের ডাকও তত বাড়ে। যখন কাছাকাছি চারপাঁচটি পাখি একসঙ্গে ডাকতে থাকে তখন খুব খারাপ শোনায় না। মনে হয়, কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে। সাধারণত সন্ধে হলেই আর ডাক শোনা যায় না। কিন্তু প্রজননকালে জ্যোৎস্নারাতে এদের ডাক দু'একবার শুনেছি।

সেকরাপাখির প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে জুন। মাঝে মাঝে একই বছরে দুবার পরপর ডিম ফুটিয়ে ছানা প্রতিপালন করে। বাসার জন্যে জায়গা খুঁজতে গাছের কাণ্ড বা ডাল আঁকড়ে বসে ঠিক কাঠঠোকরার মতো তার চৌকো ছোট্ট লেজের উপর ভর দিয়ে। আবার কাঠ-ঠোকরার মতো গাছের কাণ্ডে বা ডালে কোথায় নরম অংশ আছে তাই দেখতে ঠুকতে ঠুকতে বেয়ে ওঠে।

বাসার উচ্চতা হয় ৭ থেকে ৪০ ফুটের মধ্যে। কাণ্ড অপেক্ষা গাছের মোটা ডালের তলায় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। পাতার আড়ালে সুড়ঙ্গের মুখটা ২ ইঞ্চি গোলাকার। প্রতি বছর সুড়ঙ্গ বাড়িয়ে চলে। চারপাঁচ ফুট পর্যন্ত সুড়ঙ্গ লম্বা হতে দেখা যায়। সুড়ঙ্গ যখন বেশি বড়ো হয়ে যায় তখন সুড়ঙ্গের শেষে ডিম পাড়ার জায়গাটার কাছে যাবার জন্যে যতটা কাছে হয়

সেকরাপাখি

বাইরে থেকে আবার গর্ত বানিয়ে আসে। ডিমের শয্যায় থাকে খড়কুটো। এছাড়া আর কোনও উপকরণ ব্যবহার করে না। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই গাছের গায়ে গর্ত করে, সুড়ঙ্গ তৈরি থেকে ডিমে তা এবং ছানা প্রতিপালন করে। ডিম পাড়ে ২-৪টি অমসৃণ ভঙ্গুর ছোপহীন সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় ০·১৯, চওড়ায় ০·৬৯ ইঞ্চি।

[পরের সংখ্যায় শেষ হবে]

অজানা মহাকাশে

১৯

[সমাপ্ত] •

[এক]

ঝক্‌ঝক্‌ করতে করতে প্রায় গোটা প্ল্যাটফর্মটা কাঁপিয়ে ট্রেনটা এসে স্টেশনে দাঁড়াল, তার পর এঞ্জিনের চোঙা দিয়ে একরাশ কালো ধোঁয়া উগরে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল। খানিকক্ষণ একটা সোরগোল। চা-আ গ্রাম, পুরী মিঠাই, পা-আন সিগ্রেট ইত্যাদি হরেক রকমের ফেরি-ওয়ালার ডাক, দু'-চারজন যাত্রীর এদিক-ওদিক ছোটাছুটি, "কুলি-কুলি" চীৎকার, 'দস নয়া দীজিয়ে বাবু, ভগওয়ান তুমহারা ভালা করেগা' ইত্যাদি পরিচিত সকরুণ আবেদন গ্রাহ্য না করে সুশান্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

ইলেকট্রিক ট্রেন এখনও এদিকে চালু হয় নি, সুতরাং শহরটা যে খুব আধুনিক নয় একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুশান্তও তা জানত, কিন্তু কি আর করা! এখানেই সে চাকরি নিয়ে এসেছে একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হয়ে। কয়েক বছর হয়তো এখানেই কাটাতে হবে। কাজেই মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

সঙ্গে মালপত্র খুব বেশি আনেনি। কি দরকার সব কিছু টেনে আনার? দরকার মত এখান থেকেই কিনে নেওয়া চলবে। মা ছাড়া বাড়ির সবাই সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন। মা অবশ্য গোটা সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন, বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে ছেলে যাতে কোনও মুশকিলে না পড়ে; কিন্তু সুশান্ত স্মিত হাসি দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।—"এতদিন তো তোমার পক্ষপুটেই ছিলাম, এবার একটু হাত-পা খেলিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।" তাই মা-ও শেষ পর্যন্ত তেমন পীড়াপীড়ি করেন নি।

গেট পার হতেই সাইকেল-রিক্সাওয়ালারা ঘিরে ধরল। গন্তব্য স্থান শুনে এবং লোকটি এ শহরে নেহাৎই নবাগত বুঝে যার যা খুশি দর হাঁকতে লাগল - নীলাম ডাকার মত। শেষ পর্যন্ত "পুছকে দীজিয়ে" এই আশ্বাসবাণী দিয়ে একজন মাতব্বর গোছের রিক্সাওয়ালা এক রকম জোর করেই তার মালগুলো নিয়ে রিক্সার পাদানীতে চাপিয়ে দিল। তার পর প্রতিদ্বন্দ্বী রিক্সাওয়ালাদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় ডাক দিল—"আইয়ে বাবুজী, জলদী। উয়ে লোগ হরবখত এইসা পরেশান করে গা। হম্‌ ঠীক জগ্‌হ মে পৌছা্‌ দেগা। পুছকর কিরায়া দীজিয়ে গা।"

সুশান্ত আর দ্বিরুক্তি না করে রিক্সায় চড়ে বসল। মুখে রাস্তার লোকদের খবরদার খবরদার বলতে বলতে এবং হাতে ক্রমাগত হর্ন টিপে টিপে রিক্সাওয়ালা স্টেশনের ভিড় কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল।

সুশান্ত শুনেছিল এ সব শহরে নাকি প্রচণ্ড ধুলো; কিন্তু এখন দেখল যতটা লোকে বলে ততটা নয়। আর ধুলো কি তাদের কলকাতাতেও নেই? রাস্তায় জল দেবার একটা নিয়ম নাকি এক সময়,—কোন্ মান্ধাতার আমলে কলকাতায় প্রচলিত ছিল—বাবা-কাকাদের মুখে শুনেছে। ওর নিজের সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই। ও জানে, সেখানে রাস্তায় জল দেবার কাজটা এখন আকাশের মেঘের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শীতকালে মেঘও নেই, সে বালাইও নেই। কিন্তু বর্ষাকালে মেঘ তার দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করে। এত বেশি পালন করে যে সপ্তাহের সাতদিনের চারদিনই হয় তো শহরটাকে ভেনিস বলে মনে হয়। ইটালির সেই বিখ্যাত শহর ভেনিস—যেখানে যাতায়াতের রাস্তা বলতে এন্তার খালকেই বোঝায়।

আপন মনেই এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলছিল সুশান্ত। পথ এখন বেশ মসৃণ হয়ে গেছে, রিক্সা আর তত ঝাঁকুনি দিচ্ছে না। দু'পাশে বড় বড় গাছ রাস্তাটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। বট, পাকুড়, অশ্বত্থ, মহুয়া আরও কত কি গাছ,—সুশান্ত সবগুলোর নামও জানে না। তবে হ্যাঁ, ঐ কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলিকে খুবই চেনে। চারদিক্ লালে লাল করে হাসছে যেন আপন মনে।

রিক্সা হঠাৎ ডাইনে মোড় নিল। আরে, এ যে চমৎকার একটা নদী! মাঝে মাঝে বালি, বড় বড় পাথরের টুকরো এদিক ওদিক ছড়ানো, তারই গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে কুলুকুলু করে ছুটেছে জলের স্রোত। একটুও কাদা নেই, একটুও ঘোলা নয়। কবির ভাষায় একেই বোধহয় বলে কাকচক্ষু জল। যাক্, বিকেলে বেড়াবার একটা ভালো জায়গা পাওয়া যাবে তা হলে!

একটু পরেই রিক্সাওয়ালা প্যাডল থামিয়ে বলল, "ব্যস, আ গিয়া বাবুজী।"

[দুই]

বড় ব্যাঙ্কের শাখা হলেও এখানকার এই ছোট শহরে সুশান্তদের ব্যাঙ্কটা যে খুব বড়সড় হবে না একথা সুশান্ত আগে থেকেই জানত। নইলে তার মত বিশ্ব-বিদ্যালয়-থেকে-অল্পদিন-বেরিয়ে-আসা একটি ছোকরাকে কর্তারা নিশ্চয়ই এর ভার দিয়ে পাঠাতেন না। কিন্তু এসে দেখল, না, যতটা ছোট হবে ভেবেছিল তত ছোট ব্র্যাঞ্চ এটি নয়। কর্মচারীর সংখ্যাও ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণটা অবশ্য ২/১ দিনেই জানতে পারল। শহর ছোট হলেও এর আশপাশে অনেক কলকারখানা আছে, বড় বড় ব্যবসার পাইকারী কারবারও আছে। তাই ব্যাঙ্কের লেনদেনও যথেষ্ট। আর যে ভাবে তা বেড়ে চলেছে তাতে দু'-চার বছরের মধ্যে হয়তো আরও ফেঁপে উঠবে। যতক্ষণ অফিসে থাকে বেশ ব্যস্তই থাকতে হয় তাকে। তা ছাড়া—

হুঁ, তা ছাড়া ঝামেলাও আছে। তার মত একজন ছোকরা বাঙ্গালীকে এনে মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়ায় পুরোনো এবং বিশেষ করে বয়স্ক কর্মচারীরা মোটেই খুশি হয় নি। ইতিমধ্যেই তার আড়ালে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। হয় তো জোট পাকানোও শুরু হয়ে গেছে। সুশান্তর কড়াকড়ি হুকুম আর কাজে ফাঁকি দিয়ে ওভারটাইম্ বাড়ানোর ফিকিরকে প্রশ্রয় না দেওয়ার চেষ্টা অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। কি করেই বা হবে? রুজি রোজগারের একটা সহজ পথ আচমকা বন্ধ হবার গতি দেখলে কে-ই বা খুশি হয়? সেই যে একটা কথা আছে—'গদীতে গিয়ে বসলেই হয় না, তার ঝঁকিটাও সঙ্গে সঙ্গে সামলাতে হয়'—এ সে এরই মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

তবু ছুটির পর দু'-চারদিন এদিক ওদিক বেড়িয়ে বাকি সময়টা মন্দ কাটছিল না। কিন্তু এখন বন্ধুবান্ধবের অভাব তাকে বড় বিচলিত করে তুলেছে। সুশান্ত বরাবরই খুব আমুদে স্বভাবের, আর এধরনের ছেলেরা আড্ডা ছাড়া থাকতে পারে না। স্কুল থেকে শুরু করে এই আড্ডা চলে আসছে সমানে। কলেজে এসে তা আরও বেড়েছিল। কিন্তু এই নতুন জায়গায় তার নিতান্তই অভাব।

তবু নদীটা আছে। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই সে নদীর ধারে চলে যায়। একটা পাথরের ওপর বসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খরস্রোতা নদীর দিকে। দেখে দেখে একঘেয়ে লাগে না একটুও। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা কবিতা লিখে ফেললে কেমন হয়? কবিতা অবশ্য সে আগে কখনও লেখে নি। ঠিক লেখেনি বললে ঠিক হবে না, বলা উচিত লিখতে পারে নি। বাদ সেধেছে ছন্দ-মিলের কড়াকড়ি। কিন্তু এখন তো আর সে দিন নেই। এখনকার কবিতা লেখা তো অনেক সহজ হয়ে গেছে। ছন্দের দরকার নেই, মিলেরও দরকার নেই কোনও। ইচ্ছে মত কিছু শব্দ বেছে নিয়ে এদিক ওদিক সাজিয়ে নিলেই হ'ল। লোকে মানে বুঝতে না পারল তো বয়েই গেল। বরঞ্চ যত দুর্বোধ্য হবে ততই সে কবিতা হবে উচ্চাঙ্গের। তা নয় হ'ল, কিন্তু তাতে কি সুশান্ত নিজে খুশি হবে? সে তো আর লোকের বাহবা কুড়োবার জন্য

কবিতা লিখতে যাচ্ছে না! তার মনের আবেগকে কবিতায় রূপ দেওয়া যায় কিনা তাই পরখ করে দেখতে চায় সে।

সেদিনও সন্ধ্যার দিকে নদীর তীরে জলের ধার ঘেঁষে একটা বড় পাথরের ওপর বসে এইসব কথাই ভাবছিল সুশান্ত, হঠাৎ সামনের জলে কার একটা ছায়া পড়ল। পরক্ষণেই এক ভদ্রলোক,—যুবকই বলা যায়—সুশান্তর চাইতে হয়তো বয়সে অল্প কিন্তু বড়ই হবেন,—তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বললেন, "নমস্কার, নমস্কার। কয়েকদিন ধরেই দেখছি আপনি সন্ধ্যার দিকে একা একা এখানে এসে বসে থাকেন। এই বয়সের লোকের পক্ষে এটা একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় আজ আলাপ করতে এলুম। আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন?"

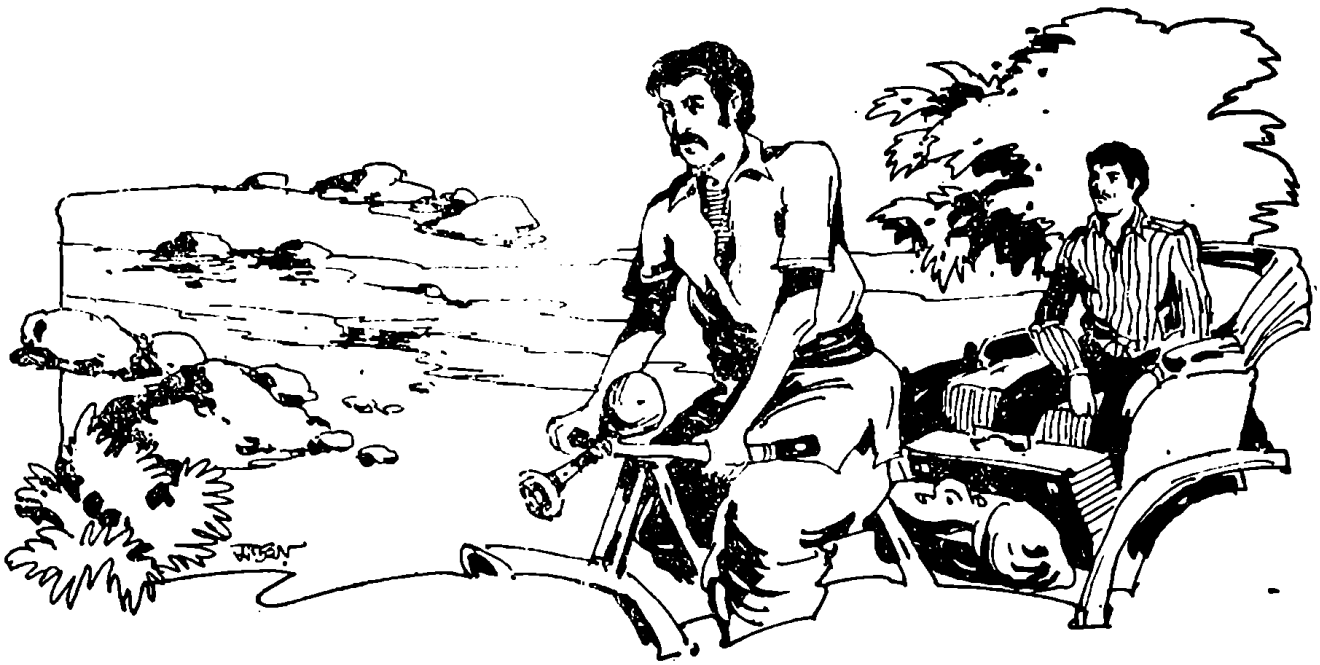

রিক্সা ডাইনে মোড় নিল।

কণ্ঠস্বর খাঁটি বাঙ্গালীর মত, এবং ভাষাটাও বিশুদ্ধ বাংলা, তবু কেন যেন সুশান্তর মনে হল লোকটি বোধ হয় ঠিক বাঙ্গালী নন, একটু যেন কেমন টান রয়েছে কথার মধ্যে। বিশেষ করে নমস্কারটা যেন নমুস্কার শোনাচ্ছে।

সুশান্ত হাসি মুখেই জবাব দিল, "ঠিক ধরেছেন। নতুন এসেছি, চাকরি নিয়ে। এখনও বড় একটা কারও সঙ্গে আলাপ হয়নি, এক ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ছাড়া।"

"ব্যাঙ্ক? তা হলে আপনিই কি এ. আই. সি. পি. ব্যাঙ্কের সেই নতুন ম্যানেজার?" সুশান্ত আস্তে ঘাড় নাড়ল।

"তাই বলুন। বেশ বেশ, আলাপ হ'ল, ভালোই হল। আমার নাম সরযূপ্রসাদ। বাড়ী এখানেই, তবে অনেকদিন দেশ-ছাড়া। তা বলে আপনার মত অপরিচিত নই। এখানকার অনেকেই আমাকে চেনে। যারা আগে চিনত না তারাও। বিশেষ করে দেখছেন তো আমার গালটা? এ আমার জন্মসূত্রে পাওয়া। কোনকালে এ আর সারানো যাবে না। অন্ততঃ এটা যে দেখবে সে-ই আমাকে মনে রাখবে।"

সুশান্ত তাকিয়ে দেখল লোকটির সারা বাঁ গাল জুড়ে বিরাট একটা জড়ুল, লাল টক্‌টক্ করছে। সত্যি একবার দেখলে পরে আর চিনতে ভুল হয় না। লোকটি বলে চলল, "তা আপনি তো বোধ হয় কাছেই থাকেন, ব্যাঙ্কের কোয়ার্টার্স এ? এখানকার ক্লাবে গেছেন কখনও? যাননি? কালই তো ক্লাবে একটা ফাংশন হচ্ছে, কালই আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব।

সরযূপ্রসাদ! নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে লোকটি বাঙ্গালী নয়। কিন্তু এমন সুন্দর বাংলা বলছে কি করে?

সরযূপ্রসাদ নিজেই সে প্রশ্নের মীমাংসা করে দিল। বলল, "কলকাতায় একটা বড় কলেজে চার বছর পড়েছি। বন্ধু বান্ধব সবই ছিল প্রায় বাঙ্গালী। কাজেই মুখে মুখে বাংলা শিখে নিতে বেশি সময় লাগে নি।

গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কাটিয়ে সরযূপ্রসাদ সেদিনকার মত বিদায় নিল। [ক্রমশঃ]

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

নিজ হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ডঃ তারকমোহন দাস

বিজ্ঞানের সঙ্গে যে শব্দটির সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তা হল 'ল্যাবরেটরি'। বিজ্ঞানের কথা উঠলেই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে নানারকম যন্ত্রপাতি ঠাসা একটা বিরাট ঘর, নানারকম রাসায়নিক পদার্থের ঝাঁঝাল গন্ধ, দিনের বেলায়ও ঘরের মধ্যে জোরাল আলো জ্বলছে, সাদা এপ্রন পরা বৈজ্ঞানিক গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেখানে কাজ করছেন। ল্যাবরেটরির বাংলা করা হয়েছে পরীক্ষাগার বা বীক্ষণাগার, কিন্তু ল্যাবরেটরি শব্দটি শুনলে মনের মধ্যে যে গভীর অর্থপূর্ণ ভাব জেগে ওঠে, পরীক্ষাগার বা বীক্ষণাগার শব্দটির মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন এক তীব্র রোমাঞ্চকর অনুভূতির স্বাদ পেতাম 'ল্যাবরেটরি' এই কথাটার মধ্যে,—বৈজ্ঞানিকরা কেমন সেখানে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পান। মাইক্রোস-কোপের তলায় কত বিচিত্র জিনিস দেখেন,—ঈস্ আমি যদি একবার ঐ সুযোগ পেতাম! জীবনের সব সুখ, সব সার্থকতা মনে হত ঐখানেই যেন লুকিয়ে আছে।

তোমরা যারা বিজ্ঞানকে ভালবাস, আমি জানি তোমাদের সকলের মধ্যেই এই অনুভূতি আছে, কিন্তু সেটা কি করে বাস্তবে পরিণত করা যায়? ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করবার এই স্বপ্ন, এই আনন্দ বাস্তবে পরিণত করা কিন্তু খুব দুরূহ বা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

শুধু বই পড়ে কখনও বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞানের যে তথ্য থাকে, যদিও তা পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত, তবুও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে পরীক্ষা করে দেখতে হয়,—তা ঠিক ঠিক মিলছে কিনা। কি করে পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করতে হয়, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়,—সেটাও শেখা হয়। বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন মনগড়া অলীক কল্পনা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করি তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল শর্তই লঙ্ঘন করা হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্ব প্রধান বিষয় হল এই পরীক্ষা বা এক্সপেরি-মেণ্টেশান! প্রথমে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ, তারপরে ঐ পর্যবেক্ষণ থেকে নানারকম প্রশ্ন এবং একটি কল্পিত ধারণা তৈরী, তার পরে হাতেকলমে পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করে দেখা ঐ কল্পিত ধারণাটি সত্য কি মিথ্যা।

জীবন-বিজ্ঞান শিখতে হলে, জীবন-বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে তোমাদের পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও পরীক্ষার বিষয়-গুলি অবশ্যই হবে নানারকম গাছপালা, ফুলফল, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও মানুষ এবং তাদের বিচিত্র জীবন-পদ্ধতি, তাদের সঙ্গে মাটি, জল, বাতাস ও নানারকম জড় পদার্থের সম্পর্ক—এগুলি তোমার চোখের সামনেই,—তোমার ঘরের আশেপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে, তুমি যে রাস্তা ধরে স্কুলে যাও, যে মাঠে খেলা কর, যে পুকুরে মাছ ধর সেখানেই রয়েছে জীবনবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার বিষয়গুলি; জীবনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিটা তাই অনেক বড় এবং জীবনবিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরীক্ষা করতে হলে প্রথম প্রথম যে খুব জটিল যন্ত্রপাতি দরকার তাও নয়। তোমার পড়ার ঘরের একটা আলমারির মধ্যে অথবা পড়ার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি রাখা যেতে পারে,—যেমন একটা লেন্স, মাপবার একটা লম্বা ফিতা, দু-একটা কাচের পাত্র, স্পিরিট ল্যাম্প, ছোট একটা দাঁড়ি-পাল্লা, কাঁচের নল, দু-একটি শিশিতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ, গাছ-পালা ও কীট-পতঙ্গ সংরক্ষণের জন্য খাতা, কাগজের বাক্স, কাচের জার ও পরীক্ষার বিবরণ লেখবার জন্য নোটবুক,—প্রথমে এই নিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

এই রচনার প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছি বিজ্ঞান বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, কল্পিত ধারণা, পরীক্ষা, প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু জীবন-বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় তা বলা হয়নি। জীবনবিজ্ঞান বলতে বোঝায়—জীবাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবের আকার, জীবনক্রিয়ার মূল প্রকৃতি, পরিবেশের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা, স্থায়িত্ব, স্বাভাবিক বিকাশ ও বিবর্তনের মূল বিষয়গুলি।

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ তাই শুরু করা যেতে পারে জীবনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির জানার মধ্য দিয়ে,—যেমন আমাদের চারপাশে যে সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্তু রয়েছে তাদের সঙ্গে অন্যান্য জড়পদার্থের পার্থক্য ও সাদৃশ্যগুলি কি? কিভাবে পরীক্ষা করলে তা জানা যেতে পারে? জড়ের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি? পৃথিবীতে জীবনকে টিকে থাকতে হলে কি কি প্রধান জড়পদার্থের প্রয়োজন হয়? কিভাবে পরীক্ষা করলে তা জানা যায়? পৃথিবীতে এতরকম উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তাদের মূল গঠন বৈশিষ্ট্য-গুলি কি?—যার ওপর নির্ভর করে তাদের চেনা যায়, সনাক্ত করা যায়,—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

কিভাবে পরীক্ষা করলে সেটা জানা যায়, ইত্যাদি।

জীবনবিজ্ঞান পড়তে বসে তুমি যদি প্রথমেই প্রশ্ন কর জীবন কি? তাহলে কিন্তু মাস্টারমশাইকে খুব মুস্কিলে পড়তে হবে। পৃথিবীতে যদি কোন শব্দ থাকে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা মনে হয় প্রায় অসম্ভব তা হ'ল জীবন। জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ও আধুনিক বিজ্ঞানে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু জীবনের কোন সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ সংজ্ঞা আজও নির্ধারিত হয় নি। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২), যাঁকে বলা হয় জীববিজ্ঞানের জনক, তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে জীবিত বস্তু হিসাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু জীবনের কোন সংজ্ঞা দেননি।

জীবন কি তা বোঝা বা বোঝান খুব শক্ত হলেও কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী জীবিত কি মৃত। জীবনের এই লক্ষণগুলি সকল জীবের ক্ষেত্রে একই রকম। এগুলি জীবনের সাধারণ লক্ষণ বা মূল বৈশিষ্ট্য। জীবনের এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে আমাদের জানতে হবে এবং পরীক্ষা করে দেখতে হবে তা সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে একইভাবে বিদ্যমান কিনা। জীবনের এই সাধারণ লক্ষণগুলি হল নড়াচড়া, খাদ্যগ্রহণ, বৃদ্ধি, শ্বাসকার্য, উত্তেজনায় সাড়া, দূষিত পদার্থ মোচন, বংশবিস্তার ও ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

জীবন্ত প্রাণী মাত্রই নড়াচড়া করে। মৃত্যুর পর এই নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তার দেহ তখন জড়-পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু একজন মানুষ যখন কোন কারণে অচৈতন্য হয়ে পড়ে তখনও তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার দেহে তখনও জীবন থাকে। অচৈতন্য মানুষের দেহে যে জীবন আছে তা বুঝবে কি করে? কিংবা তোমার কোন বন্ধু গাছের একটি ফুল বা পাতা ছিঁড়ে এনে তোমায় যদি বলে এটি জীবিত কি মৃত—তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর, তুমি তখন কি করবে? নড়াচড়া, বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণ কোনটাই এখানে দেখাতে পারবে না। তবে জীব মাত্রই শ্বাসকার্য করে থাকে, সেটা দেখাতে পার। শ্বসন জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। বেঁচে থাকতে হলে জীবের প্রতি মুহূর্তে শক্তির প্রয়োজন। জীব শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য থেকে ঐ শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। পৃথিবীর সকল রকম উদ্ভিদ ও প্রাণী দিবারাত্র সব সময়ই শ্বাসক্রিয়া করে থাকে। এই সময় বাতাস থেকে তারা অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে (কেবল অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া ছাড়া, তারা খাদ্য থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য করে)। একটি অচৈতন্য মানুষ নড়াচড়া বন্ধ করলেও তার নাসারন্ধ্রের তলায় হাত রাখলে বোঝা যায় শ্বাসকার্য চলছে, তাই তখনও সে জীবিত। শ্বাসকার্যের সময় বুকটা সামান্য ওঠা-নামা করে, সেটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এটা ঘুমন্ত কুকুরের বেলায় খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। একটি মানুষের দেহে প্রাণ আছে কি নেই তা বোঝার জন্য অনেক সময় মৃতকল্প ব্যক্তির বুকের ওপর জলপূর্ণ ছোট একটি পাত্র রাখা হয়, পাত্রের জল যদি সম্পূর্ণ স্থির থাকে তাহলে বুঝতে হবে দেহে প্রাণ নেই।

গাছ থেকে তুলে আনা একটি ফুল বা পাতার মধ্যে জীবন আছে কি নেই তা পরীক্ষার জন্য শ্বাসকার্যের পরীক্ষাটিই সবচেয়ে প্রশস্ত। প্রতিটি জীবন্ত কোষই শ্বাসকার্য করে থাকে। তুমি খুব সহজেই তোমার ল্যাবরেটারির মধ্যে এটা পরীক্ষা করে দেখাতে পার। একটি শিশির মধ্যে ফুল বা পাতাটি টুকরো টুকরো করে কেটে রাখ (টুকরো টুকরো করে কাটলেও ফুল বা পাতার সজীব কোষের মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে না)। এখন কিছু তুলো ঐ শিশির মধ্যে প্রবেশ করাও, তারপর কঠিন কস্টিক পটাসের একটি টুকরো ঐ তুলোর ওপর রাখ, তারপর একটি ছিপির সাহায্যে শিশির মুখটি ভাল করে বন্ধ করে দাও। ঐ ছিপির মাঝখানে আগে থেকে একটি সরু গর্ত করে নিও। একটি সরু কাচের নল স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় ধরে ইউ-এর আকারে বেঁকিয়ে নাও (ছবি দেখ)। তারপর নলের একটি মুখ ছিপির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। একটি ছোট পাত্রে বাদাম তেল নাও, নলের অপর মুখটি বাদাম তেলের মধ্যে ডুবিয়ে

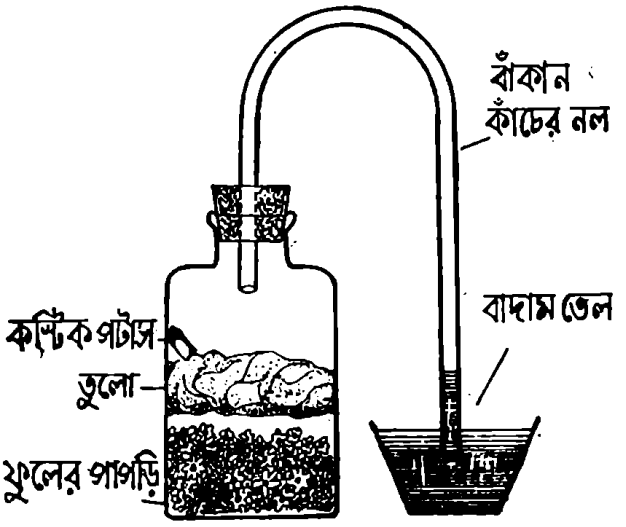

রাখ। সামান্য ভেসিলিন ছিপির গায়ে ভাল করে মাখিয়ে নাও যাতে ঐ পথে কোন বাতাস যাতায়াত না করে। সমস্ত যন্ত্রটিকে এইভাবে তিন-চার ঘণ্টা রেখে দাও। তিন-চার ঘণ্টা পরে লক্ষ্য কর কাচের নলের মধ্যে বাদাম তেলের তলরেখা কিছুটা ওপরে উঠে গেছে।

এই পরীক্ষা থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে? কস্টিক পটাস কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। বাদাম তেলের তলরেখা কাচনলের মধ্যে ওঠায় বোঝা যাচ্ছে শিশির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল যা কস্টিক পটাস দ্বারা শোষিত হয়েছে। তার ফলে শিশির বাতাস কিছুটা বসে গেছে এবং সেই শূন্যতা পূরণের জন্য বাইরের বাতাসের চাপে বাদাম তেল নলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড এসেছে কোথা থেকে? - অবশ্যই এসেছে জীবকোষের শ্বাসকার্যের ফলে, অতএব ঐ ফুল বা পাতা জীবিত।

সবুজ পাতা নিয়ে পরীক্ষাটি করবার সময় কালো কাগজ দিয়ে শিশিটি ঢেকে নিতে হবে, নইলে একই সঙ্গে সবুজ কোষে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া চলতে থাকলে অন্য রকম ফলাফল হবে। কি রকম ফলাফল হয় তাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। তোমার এই যন্ত্রটি খুব কাজের, এই যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কুরিত বীজ, ফল, শিকড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের কোন অংশ জীবিত কি মৃত তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। প্রতিটি পরীক্ষা দু-বার করে করা দরকার, দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় শিশির মধ্যে কিছু জড়-পদার্থ যেমন কাচের টুকরো অথবা ফুল বা পাতাটিকে ফুটন্ত গরম জলে নিহত করে দেখতে হবে জড় বা মৃত বস্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে কি না, অর্থাৎ শ্বাসকার্য করে কিনা।

জড়ের সঙ্গে জীবের যা অন্যান্য পার্থক্য সেগুলিও পরীক্ষা করে দেখতে পার; তোমাদের চারপাশে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তাদের নিয়ে নানারকম পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে। বৃদ্ধি জীবনের আর একটি সাধারণ লক্ষণ। অঙ্কুরিত বীজ থেকে যখন চারা বেরয় তখন প্রতিদিন ঐ চারাগাছ লম্বায় কতটা বাড়ছে তা স্কেলের সাহায্যে মাপ নিয়ে নোটবুকে লিখে রাখতে পার। তার পাতাগুলি আকারে কতটা বাড়ছে তার হিসাব রাখতে পার,—একটা গ্রাফ পেপার পাতার তলায় রেখে, পাতার আকৃতি গ্রাফ পেপারের ওপর এঁকে নিয়ে তার ক্ষেত্রফল বার করতে পার। এই সঙ্গে একটা ছোট বিড়াল ছানা প্রতি সপ্তাহে ওজনে কতটা বাড়ছে একটা দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে তার হিসাব রাখতে পার। তুমি নিজে লম্বায় কতটা বাড়ছ, প্রতি তিন মাস অন্তর একটি দেওয়ালে পর পর দাগ কেটে তার হিসাব রাখতে পার।

এছাড়া নিজে ভেবে ভেবে এমন অনেক পরীক্ষার আয়োজন করতে পার যা থেকে প্রমাণ করতে পারবে জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে একই ভাবে বিদ্যমান এবং কোথাও যদি সূক্ষ্ম তফাৎ থাকে সেগুলি কি।

তোমার নোটবুকে প্রত্যেকটি পরীক্ষার তারিখ, বিবরণ, ফলাফল ও ছবি,—তোমার মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সহ পরিষ্কার করে লিখে রাখবে। এইভাবে এগুলে আপনা থেকে বহু জিনিস তোমার চোখে পড়বে, বহু রকম প্রশ্ন তোমার মনের মধ্যে উঠবে এবং তা সত্যি কি মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখবার নূতন নূতন পন্থা তোমার মাথায় খেলবে। এটাই হল জীবনবিজ্ঞান চর্চার সঠিক পথ।

অনেক সময় একা একা পরীক্ষা করতে ভাল লাগে না, দু-একজন বন্ধু থাকলে ভাল হয়, এজন্য তোমার ল্যাবরেটারিতে দু-একজন বন্ধু নিলে ভাল হয়, তাতে নানা রকম পরীক্ষার কাজের সুবিধা হয়। বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়লে তোমাদের পাড়াতে বা তোমার স্কুলে একটা বিজ্ঞান-ক্লাব গড়ে তুলতে পার। এই বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায়, তোমার পাড়া বা তোমার নিজের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবনা-চিন্তা ও সক্রিয়ভাবে তাকে সাহায্য করা যায়। পরের সংখ্যায় আমরা এই পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করব। [ক্রমশঃ]

ধাঁধার উত্তর—শমীক, সারিবদ্ধ লাইনের তৃতীয় স্থানে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের প্রথমপর্বে জন্মদিনের উপহার পাওয়া সোনার আংটিটা পরে ছিল। এবার নিয়ম অনুযায়ী পরপর করলে দেখতে পাই,

(সারিবদ্ধ লাইনের অবস্থান সংখ্যা)

৩ × ২ + ৫ = ১১, ১১ × ৫ + ১০ = ৬৫

৬৫ + ২ (কারণ, বাম হাত) = ৬৭

৬৭ × ১০ + ৫ (কারণ, কনিষ্ঠাঙ্গুলি) = ৬৭৫

৬৭৫ × ১০ + ১ (কারণ প্রথম পর্ব) = ৬৭৫১

এবার সর্বশেষ যোগফল ৬৭৫১ থেকে ৩৫০০ বিয়োগ করলে আমরা পাই (৬৭৫১-৩৫০০) ৩২৫১। বিয়োগ ফলের সর্ব বামদিকের প্রথম রাশি—৩ হল শমীকের সারিবদ্ধ লাইনে অবস্থান সংখ্যা, দ্বিতীয় রাশি ২—হল শমীকের বাম হাত, তৃতীয় রাশি—৫ হল শমীকের কনিষ্ঠাঙ্গুলি আর সর্বশেষ রাশি—১ হল আঙ্গুলের প্রথম পর্ব। যে কোন হাতে, যে কোন আঙ্গুলের যে কোন পর্বে আংটির অবস্থান, সর্বশেষ যোগফল থেকে সর্বদা ৩৫০০ বিয়োগ করলেই এদের সঠিক চরিত্র পাবো।

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আজকাল এরোপ্লেন থাকায় আমাদের কতোই না সুবিধে হয়েছে! হুস্ করে হিল্লী-দিল্লী চলে যাচ্ছি আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। আগেকার দিনে এত তাড়া-তাড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব হোত না। পাল্কী বা গরুর-গাড়ীতে করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে কতো সময় লাগত তা একবার ভেবে দেখ!

ধর, তুমি কোলকাতা থেকে তোমার বাবাকে লণ্ডনে একটা চিঠি পাঠাবে। চিঠিটা খুবই জরুরী। ব্যস—কিছু ভাবনা চিন্তা না করে তুমি তোমার চিঠির খামে এয়ার-মেলের টিকিট লাগিয়ে দাও। তাহলেই হোল—চিঠিখানা পাখনা মেলে উড়ে খুব তাড়াতাড়ি লণ্ডনে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। এয়ার-মেল সার্ভিস হওয়াতে আমাদের আজ কত সুবিধে হয়েছে যে তা বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ চিঠি, পার্সেল, গ্রিটিংস কার্ড—আরও কতকি এয়ার-মেল সার্ভিসের দৌলতে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম এয়ার-মেল সার্ভিস চালু হয় ১৯১০ খৃস্টাব্দে। গ্রেহাম হোয়াইট নামে একজন ভদ্রলোক ব্লাক-পুলে উপর থেকে চিঠি বিতরণ করেন অবশ্য বেসরকারী ভাবে। ভারী মজার ব্যাপার এটা তাই না?

ভারতবর্ষে এয়ার-মেল সার্ভিস চালু হয়েছিল ইংরাজ-দের রাজত্ব কাল থেকেই।

এ ছাড়া এরোপ্লেনের সাহায্যে আজকাল হামেশাই আকাশ থেকে ফটোগ্রাফ নেওয়া হচ্ছে। আকাশ থেকে নেওয়া ছবি দেখে এখন অবশ্য কেউ আর অবাক হয় না—এসব এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আকাশ থেকে প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একশ' পঁচিশ বছর আগে। ন্যাদার নামে ফ্রান্সের একজন লোক বেলুন থেকে প্যারী শহরের কয়েকটি সুন্দর দৃশ্য তুলেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গতিবিধি সঠিক-ভাবে জানবার জন্য আকাশ থেকে অজস্র ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়। আজকাল টেলিফোটো লেন্সের সাহায্যে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের ছবি সহজেই আমরা তুলতে পারি। এ ছাড়া সিনেমা, টেলিভিশনে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়না-ভিরাম রঙ্গীন দৃশ্য তোলাও হচ্ছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মাটিতে কোথায় খনিজ-পদার্থ আছে তা আকাশপথের ফটোগ্রাফ থেকে বুঝতে সুবিধা হয়। কোনও জায়গার সঠিক মানচিত্র তৈরী করতেও আকাশ থেকে তোলা ছবি খুব কাজে আসে।

দক্ষ বিমান চালকরা আকাশ পথে এরোপ্লেন নিয়ে কত রকম ডিগবাজী খেয়ে আমাদের অবাক করে দেন। এর নাম এরোবেটিকস। এরোপ্লেনের যন্ত্রের উপর যথেষ্ট কণ্ট্রোল না থাকলে এই ভেল্‌কিবাজী দেখানো যায় না।

গায়ের জোরে বেশী দাঁড় ঠেলতে পারলেই সে বড় মাঝি হয় না। বড় মাঝি হতে হলে জল চেনা চাই। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে নৌকা পড়লে দেখা যায় মাঝি নৌকা-টাকে কিনারা থেকে অনেক দূরে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে ফেলেছে। যারা জল চেনে না তারা এতে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে—মাঝি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে নৌকাটাকে ক্রমেই গভীর জলে নিয়ে যাবে। কারণ সে জানে জল যত গভীর, উদ্বেলতা তার তত কম।

আকাশ পথে যারা চলে সেই ব্যোমযান যাত্রীদের পক্ষেও ঠিক ঐ একই কথা—বাতাস চেনা চাই। ভূ-পৃষ্ঠের যত কাছে থাকা যাবে বায়ুর চাঞ্চল্য ততই বেশী। দু'হাজার পাঁচশ' ফুট উপরে বায়ু বড়ই উদ্বেল ও অস্থির। ছয় হাজার থেকে দশ হাজার ফুটের মধ্যে বায়ুমণ্ডল অনেকটা অচঞ্চল ও স্থির। কাজেই মাঝ নদীর ভিতর দিয়ে গেলে যেমন স্রোত ও তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কম, তেমনি এই দশ হাজার ফুট উপরের বায়ুমণ্ডল দিয়ে বিমান চালালেও ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

আকাশের খুব উঁচুতে—পৃথিবী পৃষ্ঠ ৬½—৭ মাইল উপরে প্লেনের এঞ্জিনগুলো ঠিকমতো কাজ করতে চায় না। সেখানে বায়ুর চাপ খুবই কম; কাজেই সিলিণ্ডারে দমকা হাওয়াকে ঘিরে রাখবার জন্যে ইঞ্জিনে একটা সুপার-চার্জার (Super-Charger) ফিট করে নিতে হয়।

একবার যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চারজন আমেরিকান বোমারু বিমান এগারোটা জাপ প্লেনকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছিল। বোমারু বিমানগুলি পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে অদম্য শক্তিতে জাপানীদের 'Zero' বিমানগুলিকে আক্রমণ করে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাতটি জাপানী যুদ্ধ-বিমান আকাশের খুব উঁচুতে ওঠার দরুন তাদের কার্যক্ষমতা হারিয়ে আগুন লেগে নীচে পড়ে যায়। বাকী চারখানা বিমান বেগতিক দেখে

লেজ গুটিয়ে যায় পালিয়ে।

আমেরিকান প্লেনের এটা সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ হ'ল টার্বো-সুপার-চার্জারের (Turbo-Super-Charger) কৌশল। কোনও মানুষ সাধারণতঃ পনের হাজার ফুট উপরে উঠলে যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ঠিক তেমনি টার্বো-সুপার-চার্জার ছাড়া একটা বিমানও বেশী উপরে উঠলে অচল হয়ে পড়ে যাবে। বিমান চালকের পক্ষে অক্সিজেন যে কাজ করে—প্লেনের পক্ষেও সুপার-চার্জার ঠিক সেই কাজ করে। প্লেনখানি সাতশো ফুট উপরে যে স্বাচ্ছন্দ্য পায়—এই সুপার-চার্জারের জন্যে ৭ মাইল উপরেও সে সেই স্বাচ্ছন্দ্যই পেতে পারে।

সুপার চার্জারের ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই ঃ এরোপ্লেনের এঞ্জিনটাকে এমন ভাবে বোকা বানানো হয় যাতে সে ভাবে সমুদ্রের লেভেলেই সে রয়েছে। Dr. Moss যিনি এই সুপার চার্জারের আবিষ্কর্তা তাঁর কথায় বলতে গেলে—'the engine is fooled into thinking it is at sea-level; ইঞ্জিনটাও কি আশ্চর্য হবার মতো তাই ভাবে। ইঞ্জিনের এক্সহস্ট থেকে অগ্নিশিখার ঘূর্ণপাক দিয়ে পরিচালিত টার্বাইন দ্বারা কম্প্রেসরটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

"আমরা মধ্য আফ্রিকার উপর দিয়ে যাচ্ছি। নীচে বকের মতো লম্বা ঠ্যাংওয়ালা মানুষ—বিল, ঝোপ, জঙ্গল। একটা বন্য হাতীর পাল চলেছে মন্থর গতিতে। এরোপ্লেনের শব্দে তাদের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু এদিকে যে একটা কালো মেঘের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি—সে খেয়াল করিনি কেউই। একটা ধূসর বর্ণের ধূম্রজাল ঘুরে ঘুরে উপরের দিকে আসছে। মনে পড়ছে আরব্য উপন্যাসের জেলে, মাটির কলসী, ধূম্রজাল আর সেই ভূতের ছবি।

অলটি-মিটার (উচ্চতা মাপক যন্ত্র)—এর দিকে তাকিয়ে দেখি, কাঁটাটা আট হাজার, ন-হাজার ক্রমে দশ হাজার ফুটে এগিয়ে যাচ্ছে। ধূসর বর্ণের বাষ্পজাল প্লেনের পাখায় যাচ্ছে জড়িয়ে। চিবুকে যেন শীতল কর-স্পর্শ। হঠাৎ প্লেন-খানা কাত হয়ে পড়ল। নীল একটা আলো যেন আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্লেনখানা পাঁচশো ফুট নীচেয় নেমে গেছে তখন। অয়্যারলেসে খবর নেওয়াও সম্ভব নয় কারণ ওটা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছে। এক ঝলক বিদ্যুৎ জানালার উপর দিয়ে খেলে গেল—প্লেনে লাগল একটা ঝাঁকুনি। আমরা এ ওর

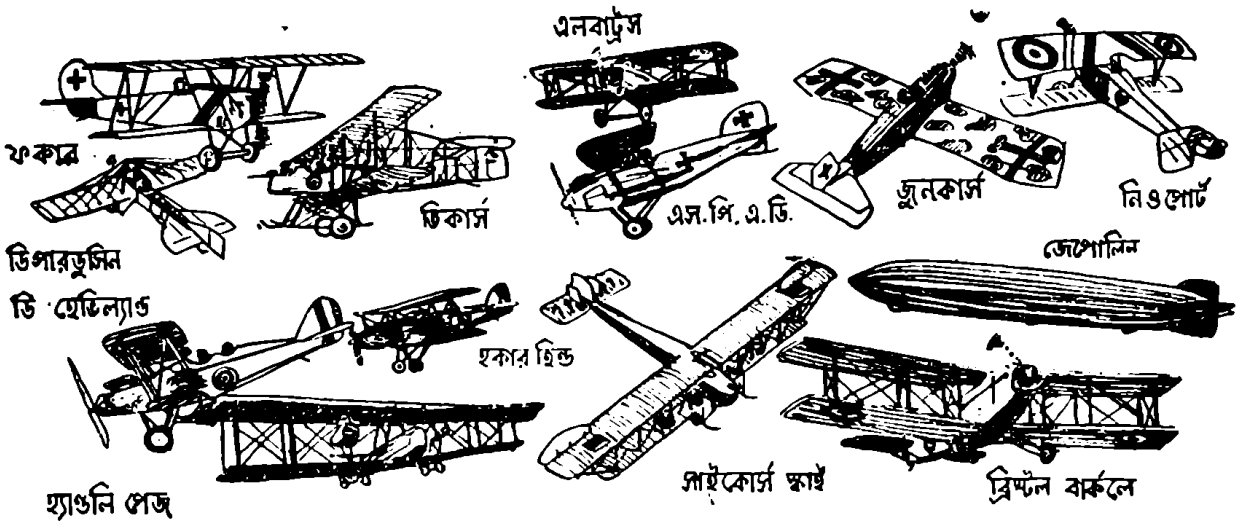

প্রাচীন যুদ্ধ বিমান

এসো, ঊর্ধ্বগগন থেকে ছ'হাজার ফুট নীচে আমরা নেমে আসি। মেঘলোকের পাশ দিয়ে, রামধনুর কোল ঘেঁসে, বিচিত্র বিচিত্র দেশ ও গিরি পর্বতের উপর দিয়ে ব্যোমযানে পাখীর মতো উড়ে যাওয়া কল্পনার দিক দিয়ে খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝা ছাড়াও অনেক মারাত্মক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত রয়েছে এই আকাশ পথে। একজন বৈমানিকের নিজের কথায় শোন—

গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। অভ্রের আবরণ দেওয়া জানালার উপর সঙ্গে সঙ্গে লাগল একটা দমকা বাতাসের ধাক্কা—কে যেন নির্মম হস্তে আমাদের ঝাঁকুনি দিচ্ছে। এটা যেন অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনা—এর মধ্যে যেন মানুষের অজানা কোনও রহস্য বিদ্যমান।

বজ্র মেঘের মধ্যে পড়লে কি অবস্থা হয় আর এক-জন বিমানযাত্রীর বর্ণনায় আমরা তা জানতে পারি—

"পাইলটের সামনে দেখা দিল একখানা বজ্র-মেঘ। প্লেনটা ছুটে চলেছে তখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে। মেঘের সহস্র কালো বাহু যেন ঘিরে ফেলল প্লেনটাকে। পাইলট তখন দিশাহারা—কি করবে সে? কে যেন তাকে ইন্দ্রজাল করছে—মতিচ্ছন্নের মতো সে ঢুকিয়ে দিল তার প্লেনের সম্মুখ ভাগ সেই মেঘ-রাক্ষসের করাল গ্রাসের মধ্যে। প্লেনখানা যেন একটা গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে নেমে গেল। চতুর্দিক অন্ধকার। একটা অস্বাভাবিক ধাক্কা মেরে প্লেনখানা যেন উপরের দিকে ছুটছে। অনেক চেষ্টা করে ইনডিকেটরের উপরের আলোটা জেলে চালক সভয়ে দেখল—সেই অন্ধকারের মধ্যে মিনিটে চৌদ্দশ' ফুট গতিতে কে যেন তাকে ছুটিয়ে দিয়েছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে স্টিক-টা চেপে ধরে সামনের দিকে ধাক্কা দিল। এমন অবস্থায় প্লেনটার নেমে আসবার কথা—কিন্তু দেখা গেল সেটা তখনও উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে প্লেনটা কাৎ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে এল যেন একটা দুর্দান্ত রাহুর গ্রাস থেকে।'

একবার একজন সিনেমার ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্যার এলাম কভাম। জলপ্রপাতের খুব কাছে প্লেনখানাকে নামিয়ে আনলে মনে হোল, কে যেন লোহার জাল দিয়ে তাঁর প্লেনখানাকে টেনে ধরেছে। অনেক চেষ্টায় এবং স্থির-মস্তিষ্কের বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান।

একবার বিখ্যাত বিমান চালক উইলিয়াম জে, ম্যাকিন কায়রো থেকে খার্তুম যাচ্ছিলেন। পথে—'Valley of Kings'-এ এলেই তার ওয়্যারলেস আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। অনেক বৈমানিক ঈজিপ্টের ফ্যারাওদের সমাধি স্তম্ভগুলির উপর দিয়ে চলবার সময়ও ঠিক এই অবস্থা লক্ষ্য করেছেন।

যাঁরা বিমান চালান তারা অনেক সময় বলেন পৃথিবীর যেমন অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি নে, আকাশ পথেও তেমনি রহস্যময় ইন্দ্রজালের অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রেও সেক্সপীয়রের সেই অমর বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়—'There are more things in heaven and earth that your philosophy can't discover',

মনে কর, এক্ষুনি তোমার মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে চারটে ইঞ্জিনওয়ালা বিরাট একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। কেউ যদি তোমাকে বলে ওটার নাম—'ফ্লাইং ফোরট্রেস' (Flyling Fortress) আর ওর মধ্যে কোনও পাইলট নেই তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে-কি বল? না ভয় পাবার কিছু নেই—বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পাইলটবিহীন এরোপ্লেন এখন দিব্যি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোনও ভৌতিক কাণ্ড কারখানা এটা নয় মোটেই!

এই ফ্লাইংফোরট্রেস বিমানে থাকে অনেকগুলো রেডিও-রিসিভার যন্ত্র। এদের কেউ প্লেনটাকে মাটির উপর দিয়ে ছুটিয়ে নেয়, কেউ আবার ইনফ্রা রেড ফটোগ্রাফির সাহায্যে শত্রু এলাকার সমস্ত ছবি তুলে নেয়, কেউ আবার প্লেনটাকে কখনও কাৎ করে কখনও আবার সোজা করে দেয়—এই সব।

মাটি থেকে কণ্ট্রোল রুমে বসে পাইলটবিহীন প্লেনকে বেতার-সংকেত দিয়ে আকাশে খুশীমতো ওড়ানো, আবার যথারীতি নীচে নামিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য—তাই না?

যে সব বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তারা প্রচণ্ড জোরে উড়তে পারে। গতিবেগই হচ্ছে তাদের প্রধান বিশেষত্ব। সেকালের যুদ্ধ আর একালের যুদ্ধ এক নয়। এখন ধা করে শত্রুসৈন্য আকাশ পথে কোথা দিয়ে এসে দুম্ করে বোমা ফেলে পালিয়ে যাবে—তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

'ডেস্ট্রয়ার'—নামে যুদ্ধ বিমানে বৈমানিক একটা আলাদা কেবিনে বসতে পারে। যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বিমানকে আকাশে বহু উঁচু দিয়ে—প্রায় নয়-দশ মাইল বা তার চেয়েও বেশী উপর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তাই এখানে প্লেন চালানোর জন্য বৈমানিক অক্সিজেন ও নানা-রকম সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে থাকে। খুব পাতলা ধাতু দিয়ে এই 'ডেস্ট্রয়ার' বিমান তৈরী হয়। এর এঞ্জিন খুব শক্তিশালী—প্রায় আড়াই হাজার অশ্বশক্তিরও কিছু বেশী।

উড়োজাহাজ সঙ্গে নিয়ে যায় যে সমস্ত বড় বড় জাহাজ তাদের বলা হয়—এয়ার ক্রাফট ক্যারিয়ার; প্লেনগুলো সহজেই এই জাহাজের ডেকের উপর ওঠা-নামা করতে পারে। এজন্য জাহাজেই রান-ওয়ে থাকে। জাহাজখানা তাহলে কি পেল্লাই তা বোধহয় তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ।

পুরনো ও আধুনিক কালের কয়েকটি বিখ্যাত যুদ্ধ বিমানের নাম ও ছবি দেওয়া হোল।

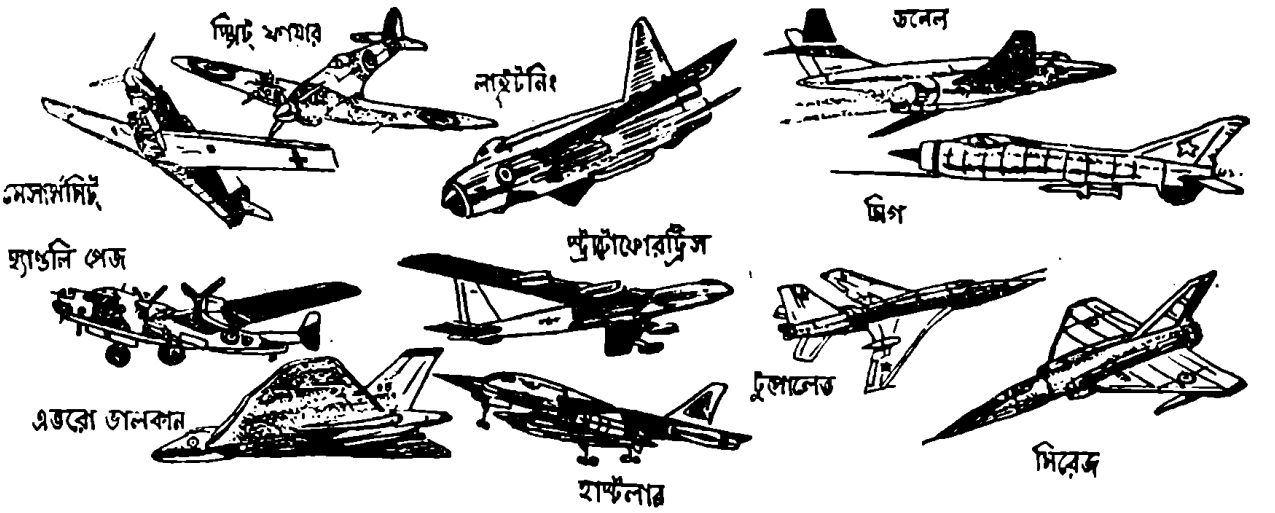

আধুনিক যুদ্ধ বিমান

ফকার ডি—৭
ডিপার ডুসিন
ভিকারস এফ বি—৫
অ্যালবাট্রস—ডি-১১১
জানকারস ডি-১
নিউপোর্ট-১৭ সি
এস. পি. এ. ডি
ডিকারস্ এফ বি-৫
ব্রিসটল-৯০
জেপলিন—আর
ডি হ্যাভি ল্যাণ্ড—
হ্যানডলে পেজ-০/৪০০

আধুনিক যুদ্ধ বিমান
স্পিট ফায়ার
মেসারস স্মিট-১০৯
বি এ সি লাইটনিং
মিগ ২১ পি এফ
ম্যাকডোনেল এফ-১০১
হ্যালিফাক্স-৬
বোয়িং স্ট্রাটো ফ্রোট্রেস
টুপোলেভ টু-২০
মিরেজ-৪
হাস্টলার
এ্যাড্রো ভালকান

মানুষ আজ মাটি থেকে আকাশে উঠছে আবার আকাশ থেকে মাটিতেও নামছে অনায়াসে। দূরকে সে নিকট বন্ধু করেছে আকাশ ফুঁড়ে মহাকাশে চাঁদের বুকেও রকেটে করে মানুষ পৌঁচেছে। হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে এ্যাঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ কনকর্ড, ডগলাস ডি সি-১০, বোয়িং-৭০৭, ৭৪৭, টুপোলেভ ১৪৪, ভি সি-১০, করনাডো, হকার সিডেলে ট্রিডেন্ট পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষকে তার প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সব দেশেই আজকাল রয়েছে এয়ার লাইন্স—যেমন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স, সুইস এয়ার ওয়েস, বৃটিশ এয়ার ওয়েস, লুফথানসা, প্যান-এ্যাম এইসব। এইসব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসের চিহ্নও প্রত্যেকের আলাদা। জুলে ভার্নে যখন 'এ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস' (Around the world in eighty days) লিখেছিলেন তখন সকলে ভেবেছিলেন ওটা নিছক কল্পনা মাত্র, সত্যিকার বাস্তবে কি আর কখনও তা রূপায়িত হবে! কিন্তু আজ আর আমরা সে কথা মনে করি না। ঈশ্বর আমাদের পাখীর মতো ডানা দেননি সত্যি—কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তার বদলে যে এরোপ্লেনের ডানা দিলেন তার মূল্যও কি কিছু কম! [শেষ]

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

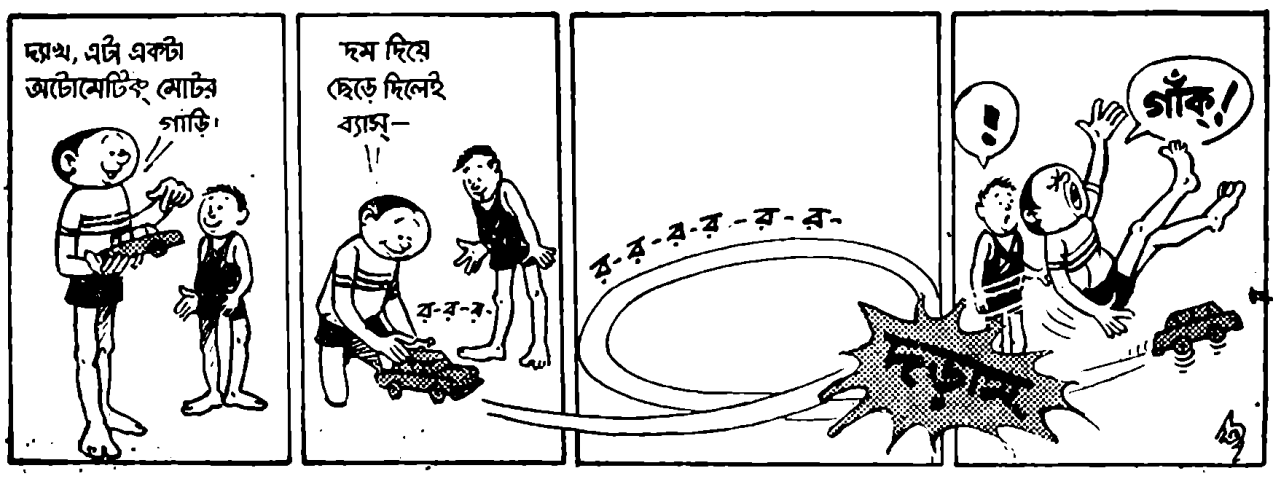

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

সংখ্যা ভাবনা

চিরকালের ত্রিভুজ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বহির্জাগতিক বুদ্ধিমান জীবের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে কি উপায়ে ? কি করে বোঝানো যাবে, যে পার্থিব সভ্যতা বহির্বিশ্বের কোনো উন্নত সভ্যতার সঙ্গে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করছে, সে সভ্যতা একেবারে অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্য নয়।

গত শতাব্দীতে গাণিতিক কার্ল ফ্রেডরিখ গস (Karl Friedrich Gauss) সাইবেরিয়াতে একটি বিরাট সমকোণী ত্রিভুজের আকৃতিতে জঙ্গল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বলা হয়, সুষম বর্ণযুক্ত করার জন্যে ত্রিভুজের অন্তর্ক্ষেত্রে গমের চারা রোপণ করা হবে। সেই সমকোণী ত্রিভুজের সঙ্গে পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্যটি সন্নিবেশ করার পরিকল্পনাও করা হয়।

পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি কি ?

সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপরে অঙ্কিত বর্গ অন্য দুই বাহুর উপরে অঙ্কিত বর্গের যোগফলের সমান। এই সত্যের উপরে ভিত্তি করে সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর উপরে একটি বর্গ স্থাপন করে সমকোণী ত্রিভুজটিকে আরও বিজ্ঞানোন্নত করা যায় কিনা, ভাবনা-চিন্তা চলে।

বহির্বিশ্বে যোগাযোগের জন্যে কেন পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি অবলম্বন করার প্রস্তাব ওঠে ?

কারণ পিথাগোরাসের উপপাদ্য এমন একটি উপপাদ্য এবং সে উপপাদ্য এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, কোনো সভ্যজাতির কাছেই তা অনুদ্ঘাটিত থাকবে না, আশা করা যায়। বাস্তবিক পিথাগোরাসের উপপাদ্য গণিতের জগতে এক শাশ্বত উপপাদ্য এবং সেই সঙ্গে পিথাগোরীয় ত্রিভুজটিও।

পিথাগোরীয় উপপাদ্যের সরলতম প্রয়োগ $3^2+4^2=5^2$ ফলটির ক্ষেত্রে ; অর্থাৎ যদি কোনো সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 আর 4 হয়, তাহলে অতিভুজ হবে 5। এবং এই দুই বাহুর উপরে অঙ্কিত বর্গের যোগফল অতিভুজের উপরে অঙ্কিত বর্গের সমান ;

3, 4, 5 এর মত এত পরিচিত না হলেও আরও অনেক সংখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে দুটি সংখ্যার বর্গের যোগফল তৃতীয় সংখ্যার বর্গের সঙ্গে সমান। (3, 12, 13) আছে বা (7, 24, 25,)—এর একটিও কিন্তু (3, 4, 5) এর আনুপাতিক নয়। এই দুটি ক্ষেত্রে $5^2+12^2=13^2$ বা $7^2+24^2=25^2$।

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলিকে এইভাবে পূর্ণসংখ্যার হিসেবে নিয়ে আসায় গণিতবিদদের অনেক চিন্তা ভাবনার ব্যয় হয়েছে। সে আজকের কথা নয়। দু'টি সংখ্যার বর্গের যোগফল তৃতীয় আর একটি সংখ্যার বর্গ হলে সংখ্যাগুলি কেমন হবে, এ নিয়ে যে আলোচনা তার মূল কৃতিত্ব খ্রীস্টীয় ২৫০ অব্দে বা সমসাময়িক কালে বর্তমান—আলেকজান্দ্রিয়ার ডায়োফ্যানটাসের। এ আলোচনা যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

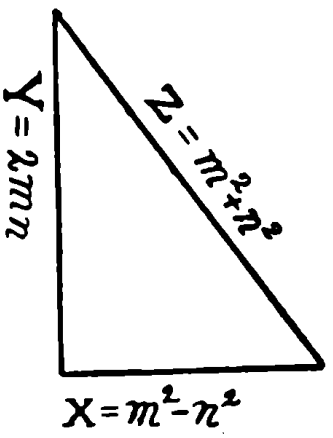

(3, 4, 5) এর মত একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির পূর্ণ সংখ্যায় সমাধানের সূত্র ঃ

একটি বাহু
$X=m^2-n^2$

অন্য বাহু
$Y=2mn$

এবং অতিভুজ
$Z=m^2+n^2$,

এখানে m এবং n যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে।

পূর্ণসংখ্যায় সমকোণী ত্রিভুজের বাহু কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাক। m এবং n-এর মান ইচ্ছে মতো ধরে নেবো।

m	n	X	Y	Z
2	1	3	4	5
3	2	5	12	13
4	3	7	24	25
5	4	9	40	41
6	5	11	60	61
7	6	13	84	85

এই তালিকাকে আমরা ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারি। কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের তিন বাহুর পরিমাণ হিসেবে যে সংখ্যা তিনটিকে নিচ্ছি, তার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলে নেওয়া যাক। সে বৈশিষ্ট্য কি কারো নজরে আসছে ? এই তিনটি সংখ্যার একটিকে 3 দিয়ে ভাগ করলে মিলবেই, আর একটিকে 5 দিয়ে ; অতিভুজ ছাড়া অন্য দুটি বাহুর গুণফলকে 12 দিয়ে ভাগ করলে তাও বিভাজ্য থাকবে। এবং তিনটি বাহুর গুণফলকে

60 দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট শূন্য।

এখন পিথাগোরীয় ত্রিভুজের বাহু তিনটি দেখিয়ে যে তালিকা তুলে ধরেছি, তা থেকেই আবার আমরা নতুন তালিকা তৈরি করতে পারি। কি ভাবে? m আর n—এ ইচ্ছে মতো মান নিয়েছি এর আগে, এখন সে মান না নিয়ে Y আর X-এর মান নেব তার বদলে।

ফল কি দাঁড়াবে? পিথাগোরীয় ত্রিভুজের বাহুর হিসেব দেখানো যে সংখ্যাগুলি পাবো, তা কি কোনো বৈশিষ্ট্যে ভরা থাকবে? দেখা যাক। এখানে m = পূর্বের তালিকার Y এবং n = পূর্বের তালিকার X।

m	n	X	Y	Z
4	3	7	24	25
12	5	119	120	169
24	7	527	336	625
40	9	1519	720	1681
60	11	3479	1320	3721
84	13	6887	2184	7225

এখানে প্রত্যেকটি অতিভুজই একটি বর্গ সংখ্যা।

এখন প্রথম তালিকার Y আর X-কে m, n হিসেবে নেওয়ার বদলে যদি আর Y কে নিই, তাহলে কি হবে?

তখন ত্রিভুজের একটি বাহুকে বরাবর পাব বর্গ হিসেবে।

m	n	X	Y	Z
5	4	9	40	41
13	12	25	312	313
25	24	49	1200	1201
41	40	81	3280	3281

পিথাগোরীয় ত্রিভুজের কোনো বাহুকে কি ঘন হিসেবে দেখানো সম্ভব? হ্যাঁ. তাও করা যায়।

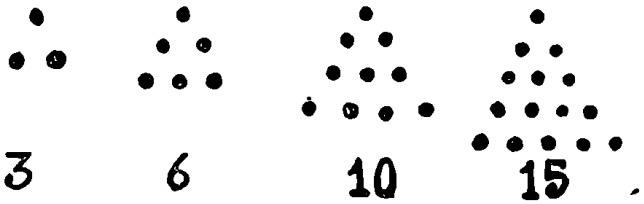

এক রকমের সংখ্যা আছে, যে সব সংখ্যাকে বলে ত্রিভুজ সংখ্যা। 1, 3, 6, 10, 15 এর দৃষ্টান্ত। এই ধরনের সংখ্যাকে ত্রিভুজ হিসেবে দেখানো যেতে পারে।

এ রকম পর পর দুটি সংখ্যাকে m, n ধরে আমরা পিথাগোরীয় ত্রিভুজের যে বাহুগুলি পাব, তার একটি বাহু বরাবর ঘন থাকবে।

m	n	X	Y	Z
3	1	8	6	10
6	3	27	36	45
10	6	64	120	136
15	10	125	300	325

পিথাগোরীয় ত্রিভুজ নিয়ে আরও অনেক কথা বলা যায়। এমন একাধিক পিথাগোরীয় ত্রিভুজ কি সম্ভব যাদের একটি বাহু বরাবর সমান? এখানে একটি বাহু বরাবর 120 এ রকম অনেকগুলি পিথাগোরীয় ত্রিভুজের একটা মিলিত চিত্র তুলে দিচ্ছি।

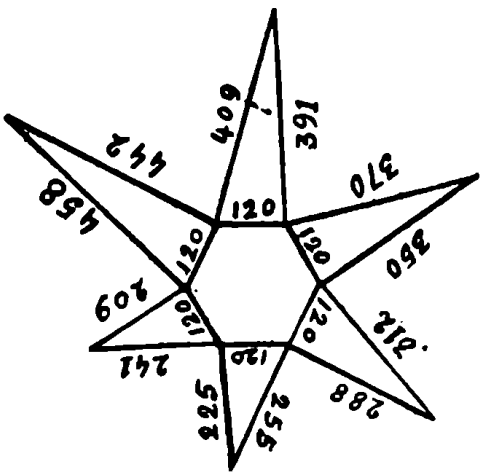

সংখ্যাবিদেরা পিথাগোরীয় ত্রিভুজ নিয়ে আরও অনেক সংখ্যাচিত্র বের করেছেন।

একটি পিথাগোরীয় ত্রিভুজের বাহু

	21	220	221
এর থেকে	201	20200	20201 আর

একটি অনুরূপ ত্রিভুজের বাহু। শূন্যগুলিকে যদি একই ভাবে বাড়িয়ে যাই, তাহলে প্রতিটি সারিরই সংখ্যা তিনটি একটি পিথাগোরীয় ত্রিভুজের তিনটি বাহু। তাহলে প্রত্যেকটি সারি কি রকম হচ্ছে?

21	220	221
201	20200	20201
2001	2002000	2002001

ইচ্ছে করলে আমরা শূন্য সহযোগে অনেক দূর এগোতে পারি।

পিথাগোরীয় সংখ্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তার শেষ নেই। সেই কবে কোন্ যুগে, কোন্ শতাব্দীতে শুরু। কিন্তু আজও তার শেষ হয়নি। সংখ্যার খেলার কি শেষ আছে?

১০৩ই কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা ২৯

সমতল তলে

আলোকের প্রতিফলন

(দ্বিতীয় পর্ব)

ডঃ অলক চক্রবর্তী

আগের বার আমরা সমতল তলে আলোকোর প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছিলাম। আরো কিছু আলোচনা এবার করছি।

একজন ব্যক্তি আয়নায় তাঁর পুরো প্রতিবিম্ব মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে চান। আয়নার মাপ কত হবে? যে কোন অংশেরই প্রতিবিম্ব দেখতে চাও, তার জন্যে

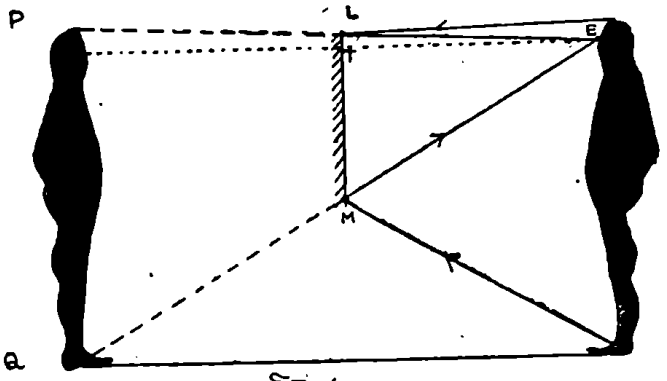

চিত্র - ১

সেই বিন্দু থেকে আলোকরশ্মি সরাসরি চোখে এসে পৌঁছানো চাই। এক নং ছবিতে দেখো, মাথার প্রতিবিম্বের উপরিভাগ থেকে প্রতিফলনের পর আলো চোখে (E বিন্দুতে) পড়ছে, তেমনি পায়ের ছায়া থেকেও আলো প্রতিফলনের পর চোখে পড়ছে। এর ফলে ব্যক্তি তাঁর সম্পূর্ণ শরীরের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। তাহলে LM হচ্ছে আয়নার প্রয়োজনীয় অংশ।

এখন সদৃশ ত্রিভুজের নিয়ম থেকে পাই.

$$\frac{LM}{PQ} = \frac{ET}{ER}$$

বা, $LM = \frac{1}{2}PQ$

কারণ ER হচ্ছে ET-র দ্বিগুণ (∵ বস্তু দূরত্ব = বিম্বদূরত্ব)। আচ্ছা, এবার আমরা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র আলোচনা করবো।

প্রথম ক্ষেত্র: দেহ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আয়নায় সম্পূর্ণ দেহের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ঠিক কথা, কিন্তু আয়নাটিকে কি যেখানে সেখানে রাখলে হবে? নীচের ছবিগুলি দেখা যাক। দু নম্বর ছবিতে আয়নাটিকে একটু তুলে দেওয়া হয়েছে আর তিন নম্বরে আয়নাটাকে একটু নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়নার মাপ অবশ্য

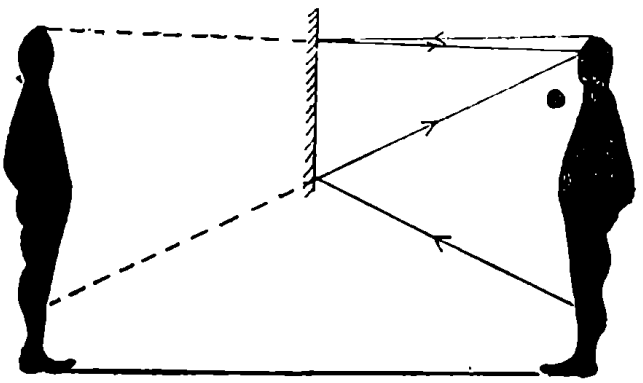

চিত্র - ২

একই আছে। দু'নম্বর ছবি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আয়না তুলে দেবার ফলে ব্যক্তিটি তার পায়ের পাতা এবং নীচের আরো খানিকটা অংশ দেখতে পাবে না। এইভাবে আয়না যতো তোলা হবে, তত নিচের অংশের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না।

আবার তৃতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আয়না নীচের দিকে নামালে মাথার উপরিভাগ এবং উপরের আরো কিছু অংশের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না। তাই আয়না যতো নিচের দিকে নামবে ততো উপরের অংশের প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: প্রথম নম্বরের ছবিটা আবার দেখ। একজন ব্যক্তি তাঁর দেহ দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছেন। এবার তাঁকে সরিয়ে ঠিক তাঁর জায়গায় যদি একজন লম্বা লোক দাঁড়ান, তাহলে তাঁর প্রতিবিম্বের অবস্থা কি হবে? যদি

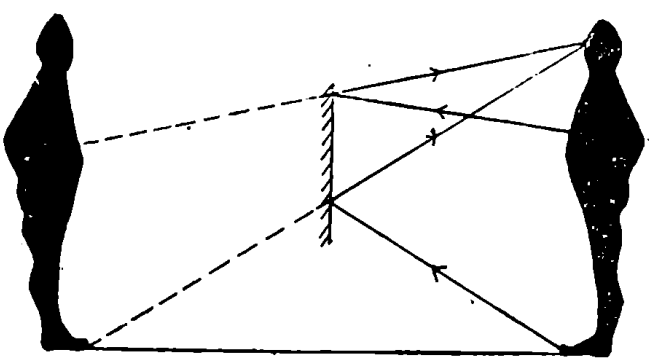

চিত্র - ৩

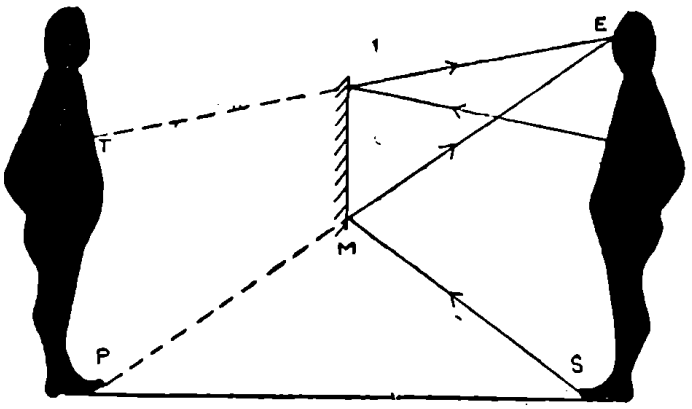

চিত্র - ৪

একজন বেঁটে লোক দাঁড়ান তাহলেই বা প্রতিবিম্বের কি হবে? চার এবং পাঁচ নম্বর চিত্র দেখা যাক! চার নম্বর ছবিতে দেখছি একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়েছেন।

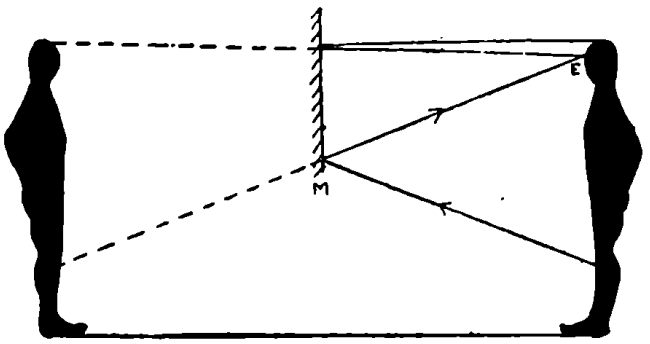

চিত্র - ৫

ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে। প্রতিবিম্বের T বিন্দু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়ছে T থেকে P পর্যন্ত সব বিন্দু থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়বে, কিন্তু T বিন্দু বা তার উপরের কোন বিন্দু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে পড়তে পারছে না কারণ প্রতিফলনের জন্য আয়না যাচ্ছে না।

পাঁচ নম্বর ছবিতে এবার লম্বা লোকের পরিবর্তে একজন বেঁটে লোক দাঁড়িয়েছেন। ভালো করে ছবিটা দেখো—এইবারে কিন্তু মাথা এবং উপরের খানিকটা অংশের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে না।

তৃতীয় ক্ষেত্র : এবার তার একটা অন্য ধরনের ব্যাপার ভাবা যাক। এক নম্বর ছবির মতো ব্যবস্থাতে দেখা

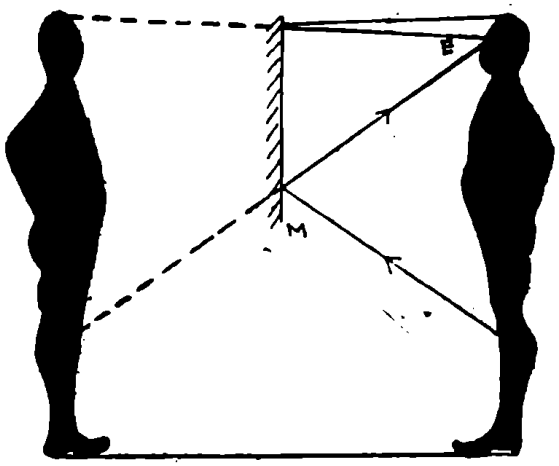

চিত্র -৬

যাচ্ছে, ব্যক্তিটি তাঁর প্রতিবিম্ব ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। আয়না ঠিক জায়গায় থাকুক, ব্যক্তি যিনি আছেন তিনি থাকুন—তবে এবার একবার তিনি একটু এগিয়ে গেলেন

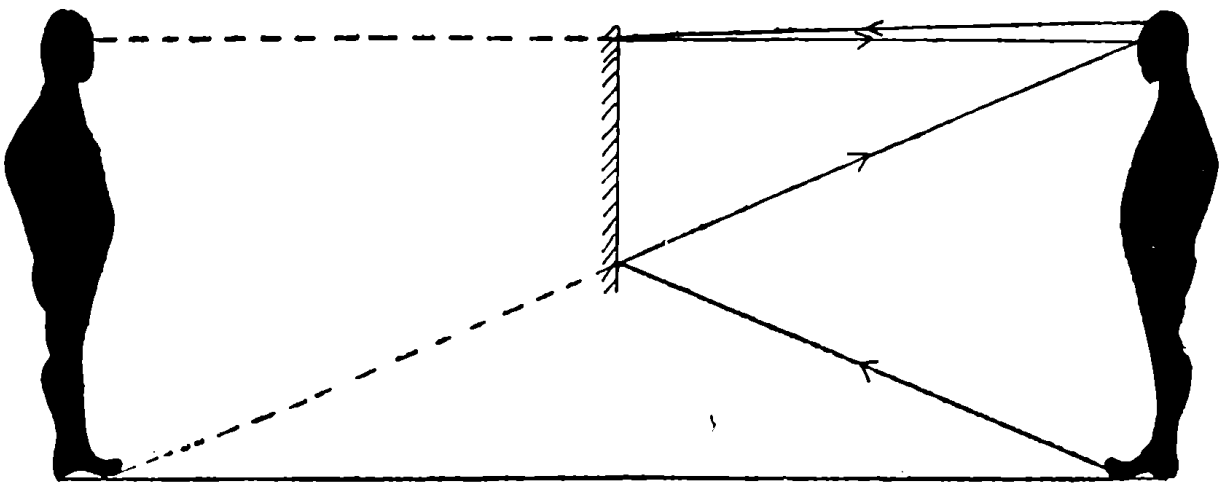

চিত্র—৭

আর একবার একটু পিছিয়ে এলেন। প্রতিবিম্বের কি অবস্থা হবে ?

ছ'নং ছবিতে দেখছি, ব্যক্তিটি খানিকটা এগিয়ে গেছেন। এর ফলে প্রতিবিম্বের অবস্থাটা কি সেটা ছবি দেখে বুঝতে পারবে। আবার খানিকটা পেছোলেও প্রতিবিম্বের কি অবস্থা হবে, সেটা ৭নং ছবি দেখে বুঝতে পারবে। ব্যক্তি যতো এগিয়ে যাচ্ছেন ততো নিচের অংশের প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং যতো পেছিয়ে যাচ্ছেন ততো উপরের অংশের প্রতিবিম্ব আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ক্ষেত্র : এবার একটা অন্য ব্যাপার আলোচনা করা যাক। আয়নার সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর প্রতিবিম্বও আয়নার পিছনে যথারীতি পড়ছে। এবার

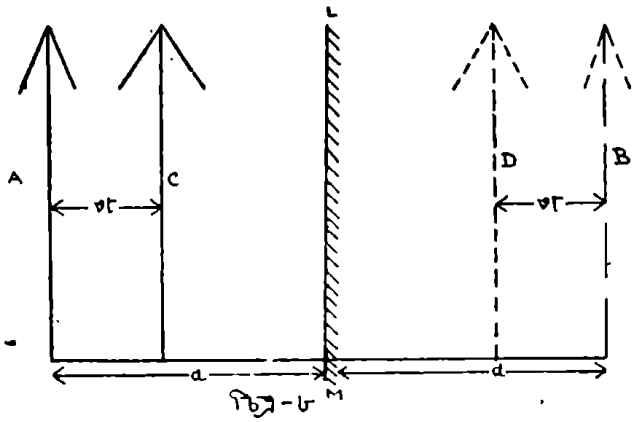

চিত্র-৮

তিনি আয়নার দিকে v বেগে ছুটতে আরম্ভ করলেন। ছুটতে ছুটতে তিনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন! তার মনে হবে প্রতিবিম্ব দ্বিগুণ বেগে ছুটে আসছে।

৮নং ছবিটি ভালো করে দেখা যাক।

LM হ'চ্ছে আয়না ; A হচ্ছে ব্যক্তির প্রথম অবস্থিতি এবং B হ'চ্ছে তাঁর প্রতিবিম্ব। যদি আয়না থেকে তার দূরত্ব d হয়, তাহলে তাঁর নিজের এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব হবে $d + d = 2d$;

এবার যদি তিনি v বেগে আয়নার দিকে ছোটেন, তাহলে t সময়ে তিনি vt দূরত্ব যাবেন এবং তখন আয়না থেকে তাঁর দূরত্ব দাঁড়াবে $d - vt$; এই অবস্থায় তাঁর নিজের এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব হবে

$$(d - vt) + (d - vt) = 2(d - vt) ;$$

তাহলে ব্যক্তির সাপেক্ষে, তাঁর ও তাঁর ছায়ার মধ্যে t সময়ে দূরত্বের পরিবর্তন $= 2d - 2(d - vt) = 2vt$

$\therefore$ আপেক্ষিক বেগ $= \dfrac{2vt}{t} = 2v$

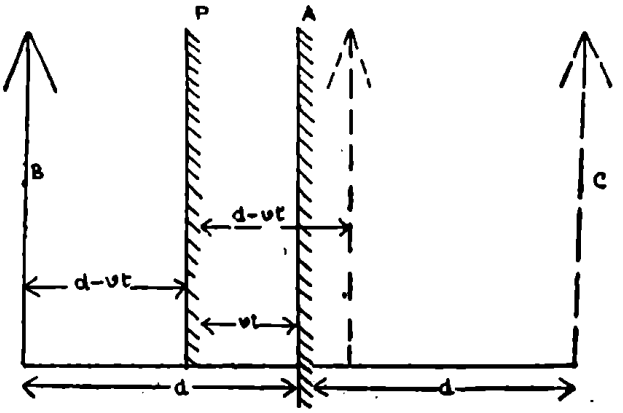

চিত্র-৯

অর্থাৎ, আয়নার দিকে ছুটতে ছুটতে তিনি যদি প্রতিবিম্ব দেখতে থাকেন, তাহলে তাঁর মনে হবে প্রতিবিম্ব তাঁর দিকে দ্বিগুণ বেগে ছুটে আসছে।

আচ্ছা বলতো ঐ ব্যক্তির পাশে যদি অন্য আর একজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাহলে প্রথম ব্যক্তির প্রতিবিম্বের বেগ ক'ত বলে মনে হবে।

পঞ্চম ক্ষেত্র : এবার আয়নাটাকে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করা যাক। ব্যক্তিকে স্থির রেখে আয়নাটাকে ব্যক্তির দিকে v বেগে ছুটিয়ে নিয়ে গেলে কি হবে ?

৯নং ছবি দেখা যাক।

ছবিটা খুব ভালো করে দেখ, A হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে আয়নার অবস্থান, B হচ্ছেন ব্যক্তি এবং c হচ্ছে প্রতিবিম্বের অবস্থান। Bc এই দূরত্ব হচ্ছে $= d + d = 2d$;

এবার আয়নাটিকে ব্যক্তির দিকে v বেগে t সময় ব্যাপী নিয়ে যাওয়া হল, এই সময়ে আয়না vt দূরত্ব অগ্রসর হবে এবং ব্যক্তি থেকে আয়নার দূরত্ব হবে $= d - vt$; বস্তু দূরত্ব এবং প্রতিবিম্ব দূরত্ব সমান বলে, প্রতিবিম্ব দূরত্ব $= d - vt$।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি ও তাঁর প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব $= (d - vt) + (d - vt) = 2(d - vt)$;

তাহলে আয়নার এই দুই ভিন্ন অবস্থানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তন $= 2d - 2d - vt) = 2vt$

এই পরিবর্তন ঘটেছে t সময়ে। অতএব প্রতিবিম্বের বেগ $= \dfrac{2vt}{t} = 2v$;

আচ্ছা বলোতো, যদি আয়নাটিকে ব্যক্তির দিকে v বেগে না সরিয়ে, ব্যক্তি থেকে দূরে v বেগে সরানো হতো, তাহলে কি হতো ?

টপাটপ্ এঁকে ফেলো। খুব সহজ !!

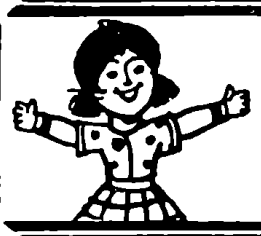

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক : জয়ন্ত দত্ত

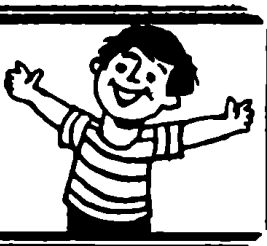

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলিত মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।

প্রশ্নের সংগে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করবে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার এপ্রিল সংখ্যার বারো বা তার বেশী সঠিক উত্তরদাতাদের নাম।

১। বিবেকানন্দ সরকার—জজকোর্ট, বহরমপুর।
২। সুদীপকুমার সামন্ত—চন্দ্রকোনা রোড, মেদিনীপুর।
৩। অমিতাভ মৌলিক—আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল।
৪। তমাল ঘটক—শ্যামনগর, শান্তিগড়, ২৭ পরগনা।
৫। দিলীপকুমার প্রতিহার—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর
৬। সমীরকুমার মাইতি—সূতাহাটা, মেদিনীপুর।
৭। অনিমেষ মাইতি—সূতাহাটা, মেদিনীপুর।
৮। মিতালী সাহা—ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। কবিরুল ইসলাম—বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১০। সমরেশ মণ্ডল—সুলতানগাছা, হুগলী।
১১। দেবব্রত দাসচৌধুরী—৪/৪, সেকেণ্ড স্ট্রীট, কলকাতা-৭৫।
১২। ইন্দ্রানীল দে—১০, দেশবন্ধু রোড, কলকাতা-৩৫।
১৩। সরিৎকুমার দাস—মালদা।
১৪। অভিক চক্রবর্তী—দুর্গাপুর, বর্ধমান।
১৫। আকাশ রায়—বিবেকানন্দ সরণী, বর্ধমান।
১৬। অঞ্জনকুমার কুণ্ডু—সুজনবাগান লেন, চুঁচুড়া, হুগলী।
১৭। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য—ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান।
১৮। আসাদুজ জামান—পিণ্ডিরা, বর্দ্ধমান।
১৯। অচিন্ত্য চক্রবর্তী—আড়ংঘাটা, নদীয়া।
২০। মৌসুমী সেনগুপ্ত—চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া।
২১। মায়ারাণী সরকার—তরঙ্গপুর, পঃ দিনাজপুর।
২২। পিনাকী পাল—রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।
২৩। অনিন্দ্য দাস—২৩৮, সতীনসেন সরণী, কলকাতা-৫৪।
২৪। নিলয় দত্ত—পুরুলিয়া।
২৫। শঙ্করচন্দ্র মিত্র—কালিকাপুর ২৪ পরগনা।
২৬। তরুণ পাল—রংগিলাবাদ, ২৪ পরগনা।
২৭। শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়—নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতন, নৈহাটি।
২৮। স্বরূপ চ্যাটার্জী—স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা।
২৯। সন্দীপন মুখোপাধ্যায়—রাইমাটাং চা বাগান, জলপাইগুড়ি।
৩০। মনসিন মুখোপাধ্যায়—রাইমাটাং চা বাগান, জলপাইগুড়ি।
৩১। জয়দেব বসাক—২৬/২/১, যোগীপাড়া লেন, কলকাতা-৬।
৩২। নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টাফ কোয়ার্টার্স কলকাতা-৩০।
৩৩। বিদ্যুৎ হাতি—রাধানগর, মেদিনীপুর।
৩৪। পল্লব মোহান্ত—পলাশীপাড়া মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, পলাশীপাড়া, নদীয়া।
৩৫। নিলয় হালদার—F-5/1 লাবণী এস্টেট, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।
৩৬। অভিজিৎ সরকার—৩৩, রামকৃষ্ণ এভিনিউ, দুর্গাপুর, বর্ধমান।
৩৭। দেবাশীষ কুণ্ডু—রাণাঘাট, নদীয়া।
৩৮। সুভাষচন্দ্র আগরওয়ালা—পলাশী পাড়া মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, নদীয়া।
৩৯। আশিস চ্যাটার্জী—কণকশালী বোসের ঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী।
৪০। প্রণবকুমার সরকার—২৪, মল্লিক পাড়া লেন, কল-৫৫

আরও নাম ৫৩ পৃষ্ঠায়

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ ১। মাদাম কুরি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কি কি বিষয়ের জন্য ?

২। বাতাসে কি কি গ্যাস থাকে ?

কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য

১৪৯, পূর্ব পুটিয়ারী, টালীগঞ্জ।

উঃ ১। বেকেরেল ও পিয়ের কুরির সঙ্গে মাদাম কুরি প্রথম বার পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯০৩ সালে। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করার জন্য মাদাম কুরি দ্বিতীয়বার রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার জয় করেন ১৯১১ সালে। পিচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম উদ্ধার করতে সফল হওয়ার জন্য।

২। শুকনো বাতাসে সাধারণতঃ আয়তনের হিসেবে নাইট্রোজেন ৭৮·০৬%, অক্সিজেন ২১%, আর্গন ০·৯৪% থাকে। তাছাড়া ১০,০০০ ভাগ বাতাসে তিন ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইট, ওজোন এবং হিলিয়াম, ক্রিপটন, নিওন ও জেনন প্রভৃতি বিরল গ্যাসেরও অস্তিত্ব থাকে। শহরাঞ্চলে প্রতি সি. সি. বাতাসে ১০০,০০০অ বধি ধোঁয়া ও ধূলোর কণা থাকতে পারে।

প্রঃ ৩। পার্চমেন্ট পেপারের দুটি টুকরোর একটি রেডিওর উপর রাখা অবস্থাতে অন্যটি দিয়ে ঠেকালে শব্দ হয়। ঠেকানো বন্ধ করলেই রেডিওর শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। (অবশ্যই রেডিওর বার্তা শোনার সময়) ; আবার ঠেকালেই শব্দ হয়। কেন হয় ?

প্রদীপ মুখার্জী

৭/১৭, মহিসকাপুর রোড, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

উঃ শীতকালে বা শুষ্ক আবহাওয়ায় শুকনো চুলে চিরুনি ঘষলে বা নাইলনের জামায় চিরুনি ঘষলে তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। পট্ পট্ করে অনেক সময় আওয়াজও হয় বিদ্যুত মোক্ষণের (electric discharge)। একই ভাবে দুটি ভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঘর্ষণ জনিত কারণে (বায়ু প্রবাহের সঙ্গে ধাতবপদার্থের ঘর্ষণেও হতে পারে) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এবং এই বিদ্যুৎ মোক্ষণের সময়ে spark হয়ে সেটাই electrical noise হিসাবে রেডিওয় ধরা পড়তে পারে। সম্ভবতঃ সেটাই ঘটেছে আপনার ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

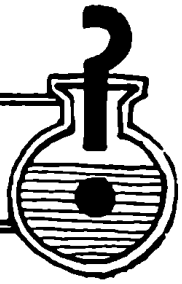

অমরনাথ রায়

১। শিরার রক্তের রঙ কেমন হয় ?

২। কিসের অভাবে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় ?

৩। খড়িমাটি জিনিসটা কি ?

৪। কপিকল কোন্ শ্রেণীর লিভার ?

৫। সোনা দ্রবীভূত হয় কিসে ?

৬। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine gland) থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের নাম কি ?

৭। The Origin of Species গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?

৮। ঋণাত্মক তড়িতের নাম কি ?

৯। কোন্ পিতা ও কোন্ পুত্র মিলিতভাবে একই সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ?

১০। 'জার্মেনিয়াম' কি জিনিস ?

১১। এক মেট্রিক টন = কতো কিলোগ্রাম ?

১২। যে জৈবাধারে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়, তার নাম কি ?

১৩। প্রাণীর দুধ থেকে যে জান্তব শর্করা পাওয়া যায়, তার নাম কি ?

১৪। পাইন, ক্যানাডা বালসাম প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আঠালো পদার্থের নাম কি ?

১৫। কোয়ান্টামবাদ উদ্ভাবন করেন কোন্ বিজ্ঞানী ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। বাড়ে। ২। লাল। ৩। গলনাঙ্ক হ্রাস পায়। ৪। অক্সিন। ৫। ডায়নামো। ৬। মারফিউরিক সালফাইড। ৭। মেণ্ডেল। ৮। কেজিন। ৯। ফ্লোরিজেন। ১০। কালো। ১১। তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। ১২। রেক্টিফায়ার। ১৩। জিন্‌কে বংশগতির বাহক বলা হয়। ১৪। কার্বন। ১৫। প্যালাডিয়াম।

———

মার্গোলিকা

উজ্জ্বলকুমার রায়

রকেট রিসার্চ স্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় বসে আমার কুটুনদা ও আমি প্রফেসর সামন্তর প্রতীক্ষায় ছিলাম।

প্রফেসর সামন্তকে পৃথিবীতে কে না চেনে? বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিশ্ব জুড়ে তাঁর নাম, যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। একটি মাত্র কম্পিউটার তৈরি করে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এই ২২৬৫ সালে দাঁড়িয়ে একটা কম্পিউটার আর এমন কি? না—এ যে সে কম্পিউটার নয়। এটাকে তৈরির পর সামন্তবাবু এটাকে মানুষের মতই এ, বি, সি, ডি···ও ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি শিখিয়েছেন। তার পর থেকে কম্পিউটারটি নিজে থেকেই সব কিছু করতে ও বলতে পারে। তবে কম্পিউটারটির ইঙ্গিত বাণী পড়বার বা বুঝবার ক্ষমতা একমাত্র প্রফেসর সামন্তর-ই আছে।

আমাদের কাছ থেকে তিনশ' গজ দুরে একটা পোক্ত লোহার ফ্রেমের মাঝে একটা রকেট তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। রকেটটির আরোহী প্রফেসর অনিরুদ্ধ সামন্ত। তিনি যাত্রা করবেন এক অজানা গ্রহের উদ্দেশে, যার হদিশ তাঁর অমূল্য কম্পিউটারটি দিয়েছে। মহাশূন্যের অজানা, অচেনা রাস্তার একমাত্র সঙ্গী তাঁর কম্পিউটারটি, এবং ওটিই তাঁর পথ নির্দেশক। আমাদের অপেক্ষার মূল কারণ হল যে প্রফেসর সামন্ত আমাদের একটা জিনিস দেখাবেন। সেই জিনিসটা যে কী, তা এখনো জানি না। কুটুনদা হল রকেট রিসার্চ স্টেশনের এক উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক, এবং আমি এই রিসার্চ স্টেশনে এক নবাগত।

এর মধ্যে আমাদের সামনে একটা কালো জিপ এসে থামলো! আধ মিনিটের মধ্যেই আমরা জিপে চড়ে সেই বিশাল রকেটটির কাছে পৌঁছলাম। টি. ভি.'র লোকদের ও অন্যান্য ওয়ার্কারদের হুড়োহুড়িতে ও কথাবার্তায় জায়গাটা গমগম করছে।

রকেটটির থেকে ঝোলানো ইস্পাতের মই বেয়ে উঠে দেখি সামনে বসে প্রফেসর অনিরুদ্ধ সামন্ত, পাশে তাঁর সাত রাজার ধন একমাণিক কম্পিউটার।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলো প্রফেসরের গমগমে কণ্ঠস্বরে।

—"এটির কথাই বলছিলাম, এটিই আমার প্রাণ, ধ্যান, জ্ঞান।"

"আপনি কি একটা জিনিস দেখাবেন বলেছিলেন।" আমি ব্যস্ত হয়ে বলি।

"হ্যাঁ, শোন। আমি যে গ্রহান্তরে যাত্রা করছি, তাতে প্রাণ আছে। সেখানের জীবেরা আমাদের থেকে সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে আড়াই হাজার বছর এগিয়ে।"

প্রফেসর সামন্ত সুইচের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুইচ 'অন' করা হল। কম্পিউটারটির এক কোণে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। যার মানে কম্পিউটারটি কাজ করতে প্রস্তুত। প্রফেসর এবার কম্পিউটারটির একটা 'নব' দেখিয়ে বললেন, "এটা গ্রহান্তরের জীবের সঙ্গে কথা বলার জন্য।" পাশের একটা 'নব' দেখিয়ে বললেন, "এটা কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলার জন্য।" তিনি দুটো সুইচের হাতল-ই নীচে নামিয়ে দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন—

"হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন? আমি পৃথিবী থেকে বলছি।"

"পাচ্ছি। ওই প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'হ্যালো' কথার এখনো প্রচলন আছে?"

বুঝলাম গ্রহবাসীরা প্রফেসরের সঙ্গে বাক্যালাপ করছে, এবং কথাগুলো আমাদের মস্তিষ্কেও বাজছে। ইতিমধ্যে প্রফেসর আবার বলতে শুরু করেছেন—

"আমরা তো বিজ্ঞান ও আধুনিকতায় অনেক এগিয়েছি। আমরা গ্রহে গ্রহান্তরে পৌঁছেছি। আর এই যে আমি একটা কম্পিউটার বানিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এটাই বা কম কিসে!"

আবার সেই বজ্রকণ্ঠ।

"মূর্খ মানুষ, তোমরা মূর্খ। একক চেষ্টার সাফল্যের গর্বে তোমাদের বুক ফুলে ওঠে। ছিঃ! তোমরা বিজ্ঞানের ভিতটাও সম্পূর্ণ জানো না, তাতেই এতো অহংকার। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি বা বস্তু হল কম্পিউটারটি। কম্পিউটারটি তুমি বানিয়েছ বলে তুমি কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমান নও!"

"হাজার বার মানি, আমরা মানুষেরা আপনাদের কাছে অতি নগণ্য। যাই হোক, আমি ও আমার কম্পিউটারটি আপনাদের গ্রহে পাড়ি দিচ্ছি। প্রস্তুতি পর্ব সব শেষ শুধু শুরু করাটা বাকি।"

আবার সেই বজ্রকণ্ঠ। এবার আরো রুক্ষ স্বর।

"তোমাকে সাফ জানিয়ে দিচ্ছি এই গ্রহে তোমার পদার্পণ করা হবে না। বরং আমরাই অতি শিগ্‌গির পৃথিবীতে পদার্পণ করে সেটিকে জয় করবো। আমাদের যুদ্ধ-যান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে গেছে।"

একটু থেমে অজানা জীবটি আবার শুরু করলো—

"আমাদের যানটা এক গোপন আস্তানায়, লোক বসতি থেকে বহু বহু দূরে আস্তানা গাড়বে। আমাদের একমাত্র দুর্বলতা যে তোমাদের গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের গ্রহের থেকে অনেক প্রবল। আমাদের স্বাভাবিক চলা-ফেরায় বিঘ্ন ঘটবে, কিন্তু, আমরা ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমরা একটি এণ্টিম্যাগ্‌নেটিক্ যন্ত্র তৈরি করেছি। যা তোমাদের পৃথিবীর অভিকর্ষ শুষে নিয়ে আমাদের সাবলীল ভাবে ঘোরাফেরার সুযোগ করে দেবে। আমি আমার সামনে রাখা একটা 'লান্‌সো'-তে, যাকে তোমরা টি. ভি. বলো, দেখছি, আমাদের লোকেরা পৃথিবীতে নেমে পড়েছে, এবং যন্ত্রটা চালু করবার ব্যবস্থা করছে। আর পৃথিবীর সময়ের হিসেবে ঠিক পঞ্চান্ন সেকেণ্ড পড়ে আমাদের যন্ত্র চালু হবে।" একটু বাদে। আর ঠিক দশ সেকেণ্ড, নয়··· আট···তিন···দুই···এক···শুরু! শুরু! "মার্গোলিকা।"

গ্রহান্তরের জীবটির উল্লসিত চিৎকারে মনে হল বুঝি মাথা ঝাঁকুনি খেলো।

"মার্গোলিকা মানে কী?" হঠাৎ আমি বোকার মত প্রশ্ন করে বসলাম।

"তোমাদের পৃথিবীর ভাষায় যার অর্থ 'সাবাস'। যাক্ সে কথা। আমি কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের রেডিওর কাজ করবো এবং জানিয়ে দেব পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে। এর-ই মধ্যে তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কমে গেছে। আকাশচুম্বী বাড়িগুলো টলমল করছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বহুতল বাড়ি 'লাঁ লিমোরাঁ' আছড়ে পড়লো। একটু আগে একটা বোইং ৫০০০ ফিট উঁচু দিয়ে উড়ছিল, হঠাৎ-ই তার উচ্চতা দাঁড়িয়েছে সারে দশ হাজার ফিট। হাঃ···হাঃ···হোঃ। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'লিনিং টাওয়ার অফ পিসা' ধ্বসে পড়লো। সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা দশটি জাহাজের সমান হয়েছে। সামুদ্রিক যানগুলি আকাশ চুম্বনের পরমুহূর্তেই পাতাল চুম্বন করছে, হাঃ···হাঃ···। এই মুহূর্তে তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চাঁদের ঠিক সমান সমান। আমাদের লোকেরা মিনি 'এণ্টি ম্যাগ্‌নেটিক্' গানগুলো খুলে ফেলেছে। সারা পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে আছে, কিন্তু আমাদের লোকদের এখনো কিছু অসুবিধে হচ্ছে। আমরা মাধ্যাকর্ষণ আরো শুষে নেবো, আরো কমিয়ে দেব, হোঃ···হোঃ···এখন তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চাঁদের থেকেও কম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তর চাঁদের বায়ুমণ্ডলের রূপ নিচ্ছে, হোঃ··· হোঃ···হাঃ···হাঃ···

আমি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম কম্পিউটারটির গায়ে গ্রহান্তরের জীবের সঙ্গে কথা বলার সুইচটা অফ করে দিতে। আমার খেয়াল থাকা উচিৎ ছিল মাধ্যাকর্ষণ কমে গিয়ে পৃথিবী এখন কোন ছোট উপগ্রহের মতো। আমি প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খেলাম রকেটটির ছাদের সঙ্গে, রকেটটি ভীষণ দুলে উঠলো, সশব্দে আছড়ে পড়লাম মেঝেতে। কষ্ট করে হাতটা বাড়িয়ে ভিন্ গ্রহবাসীর সঙ্গে কথা বলার সুইচটা অফ করে দিলাম। মাথার মধ্যে প্রলয় নাচন হঠাৎ-ই স্তব্ধ হয়ে গেল। কুটুনদাকে দেখি মানসিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে গা এগিয়ে দিয়েছে। প্রফেসর সামন্ত নির্বাক। আমি প্রফেসরকে এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলাম, অনুরোধ করলাম, কম্পিউটারের উপদেশ নিতে। আরো একটু সময় নিয়ে পুরোপুরি ধাতস্থ হয়ে তিনি অতি ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

"হে বন্ধু, কী করবো?"

কম্পিউটারের সাংকেতিক উত্তর প্রফেসর বিশ্লেষণ করে জানালেন যে ভিন্ গ্রহের জীবরা কুমেরুর এক দুর্গম জায়গায় আস্তানা গেড়েছে। রক্ষা পাওয়ার মাত্র একটা পথ-ই কম্পিউটারটি বাতলাতে পারে।

কিন্তু কম্পিউটারের উত্তরে প্রফেসর ভূত দেখার মত শিউরে উঠলেন। অতি কষ্টে তিনি বললেন যে, তার বন্ধুটি বলছে তাকে রকেটের ভার দিয়ে আমরা সবাই যেন নেমে যাই। তার পরেরটুকু বলতে গিয়ে প্রফেসরের চোখের জল বাধা মানলো না। তিনি বললেন যে, তাঁর বন্ধুটি বলছে যে সে রকেটটি চালনা করে নিয়ে গিয়ে কুমেরুতে রাখা মাধ্যাকর্ষণ শোষণকারী যন্ত্রটার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে সব চুরমার করে দেবে। বন্ধু চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে বলে প্রফেসরের এতো দুঃখ।

শেষ পর্যন্ত প্রফেসর সারা পৃথিবীর লোকের মঙ্গল কামনা করে অতি কষ্টে বন্ধুর মায়া ত্যাগ করে তার নির্দেশ মত সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

রকেট থেকে নেমে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে লাগলাম। প্রতি পদক্ষেপে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম।

আমরা তিনজন শক্ত কিছু আকড়ে ধরে বসতে না বসতেই রকেটটি মাটি ত্যাগ করলো, ও তার কয়েক সেকেণ্ড পড়েই প্র-চ-ণ্ড এক ঝাঁকুনি···

জ্ঞান হতে দেখি বেশ কিছু দূরে প্রফেসর ও কুটুনদা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, অবশ্যই অজ্ঞান অবস্থায়। কিন্তু পৃথিবী এখন স্বাধীন, ভিন্ গ্রহের আগন্তুকেরা হেরে গেছে। রকেট আর 'এণ্টি ম্যাগ্‌নেটিক্' যন্ত্রের সংঘর্ষে যন্ত্রটি তার শোষণ ক্ষমতা হারিয়েছে ও পৃথিবী তার আগের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ফিরে পেয়েছে।

এম, সি গার্ডেন রোড, কলিকাতা-২৮

নিজে নিজে কর

ওয়াটার হিটার

সুবীরকুমার বিশ্বাস

তোমরা অনেকেই হয়তো ওয়াটার হিটার দেখেছো। আজ তোমাদের এমন একটা পদ্ধতির কথা বলব যার সাহায্যে তোমরা সহজেই খুব অল্প সময়ে জল গরম করতে পারবে। এসো তবে শেখা যাক্।

প্রথমে দুটো পুরানো ব্যাটারিকে ভেঙ্গে ওর ভেতর থেকে দুটো কার্বন দণ্ড এমনভাবে বের করো যেন দণ্ড-দুটোর মাথার ধাতব টুপিটা থাকে। ব্যাটারি দুটো বড়

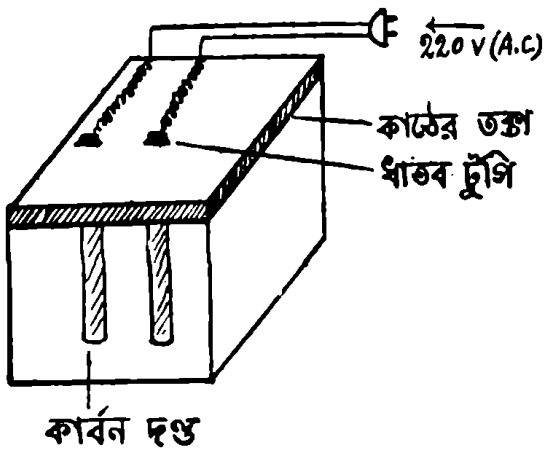

হলে ভাল হয়। এবার 6 ইঞ্চি লম্বা, 6 ইঞ্চি চওড়া আর 6 ইঞ্চি উঁচু একটা পাত্র যোগাড় কর। পাত্রটা অবশ্যই কাচ, এবোনাইট প্রভৃতি তড়িতের অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী হবে।

এবার 7 ইঞ্চি লম্বা, 7 ইঞ্চি চওড়া আর $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পুরু একটা কাঠের তক্তা যোগাড় কর। তক্তায় প্রায় তিন ইঞ্চি ব্যবধানে দুটি ছিদ্র এমনভাবে করো যেন ঐ কার্বন দণ্ড-দুটো ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যায়। এবার ঐ দুটো ছিদ্রে দুটো দণ্ডকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন কেবলমাত্র দণ্ডের ধাতব টুপিদুটো তক্তার বাইরে থাকে। খানিকটা মোমকে গলিয়ে ঐ ফুটোর ফাকে ঢেলে দাও যেন দণ্ড-দুটো শক্তভাবে এটে বসে যায়। দুটো ইনসুলেটেড ইলেকট্রিক তারের দুই প্রান্ত দণ্ডদুটোর ধাতব টুপির সঙ্গে ঝালাই করে আটকে দাও। এবার ঐ কাঠের তক্তাটাকে পাত্রের মুখে ছবির মত করে বসিয়ে দিলেই তোমার নিজের তৈরি ওয়াটার হিটার কাজ করার উপযোগী হয়ে গেল। এবার পাত্রটাতে জল ভর্তি করে তার দুটোকে মেইন লাইনে (220v A.C.) যুক্ত করলেই জল গরম হতে শুরু করবে। 10 মিনিটের মধ্যেই জলে বাষ্প উঠতে শুরু করবে।

সতর্কতা :—

(ক) তার দুটোকে এমনভাবে কার্বন দণ্ডের সাথে লাগাবে যেন তারের সঙ্গে কেবল ধাতব টুপিটার সংযোগ থাকে। (খ) জল গরম হওয়াকালীন জলে হাত দিলে শক্ লাগতে পারে। (গ) মেইন লাইনে তার লাগানো অবস্থায় দণ্ডদুটো কখনই যেন সংস্পর্শে না আসে। (ঘ) জল ছাড়া আর কিছু গরম করবে না। এতে দুধ গরম করলে দুধ জমে গিয়ে ছানা হয়ে যেতে পারে। আবার লবণ জল গরম করতে গেলে Sodium (Na) ধাতু আর ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) হয়ে যাবে।

৪১। মৌমিত্র মজুমদার—৭৩, পূর্বাচলপল্লী, রহড়া ২৪ পঃ
৪২। বুলবুল দাস—৭৩, ঘোলা রোড, বেলঘরিয়া, কল-৫৬
৪৩। সুদীপ্তকুমার জানা—মেছেদা, মেদিনীপুর।
৪৪। অপর্ণা সরকার—নাজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নদীয়া।
৪৫। শুভেন্দুশেখর ভূঁইয়া—শিকারপুর নদীয়া।
৪৬। সঞ্চয় কুণ্ডু—আড়ংঘাটা, নদীয়া।
৪৭। সুজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়—গুসকরা, বর্ধমান।
৪৮। দিবেন্দু পাণিগ্রাহী—কুষ্টিয়া হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৩৯।
৪৯। কাজল গিরি—কন্টাই পি, কে, কলেজ, মেদিনীপুর।
৫০। সোনালীরাণী বেরা—বাড় বাহার পোতা, মেদিনীপুর
৫১। পার্থপ্রতিম পাল—শেওড়াফুলী, হুগলী।
৫২। প্রলয় পাল—শেওড়াফুলী, হুগলী।
৫৩। বিকাশ মিত্র—ব্রিলিয়ান্ট কোচিং সেন্টার, কল-৩৫।
৫৪। রঞ্জনা দাস—২৬, পঞ্চাননতলা লেন, কল-৩৪।
৫৫। দেবাশীষ কুণ্ডু—আর, ই, কলেজ, দুর্গাপুর বর্ধমান।
৫৬। রাজেশ চ্যাটার্জী—খামারগাছি, হুগলী।
৫৭। সায়ন্তন চৌধুরী—৩/১, কালিপদ দাস লেন, হাওড়া-১।
৫৮। সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—বাঁকুড়া।
৫৯। শুভব্রত ত্রিপাঠী—পার্বতীপুর, তমলুক, মেদিনীপুর।
৬০। দেবব্রত সেন—হরিসভা পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।

ফুলের ফসল

অনুপকুমার ঘোষ

তোমরা সকলেই ফুল ভালোবাসো। কারণ, ফুল দেখিতে সুন্দর, শুধু কি তাই, না তাহা নয়। কারণ পদ্যমালায় তোমরা সকলেই পড়িয়াছ যে মতি যখন তাহার পিতাকে বলিল সব ফুলের চেয়ে রাঙা পলাশ ফুল ভালো তখন তাহার পিতা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন ফুলের প্রকৃত গুণ তাহার সুন্দর গন্ধ, কিন্তু তোমরা বোধহয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছ যে গোলাপ ফুল ভিন্ন অধিকাংশ সুগন্ধি ফুলের রং সাদা এবং দেখিতে তত সুন্দর নয়। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে ফুলের গন্ধের সহিত তাহার রঙের ও চেহারার বিশেষ পার্থক্য নাই। গাছ হইতে তুলিবার পর প্রায় সকল ফুলেরই অনেকক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ থাকে। এমনকি ফুল শুকাইয়া গেলেও তাহার গন্ধ একেবারে উড়িয়া যায় না। তোমাদের অনেকেরই ধারণা যে গন্ধ শুধু ফুলেই থাকে কিন্তু তা ঠিক নয়। এমন অনেক গাছ আছে যাহার পাতায় কচি ডালে সুন্দর গন্ধ, দারুচিনির গন্ধ তাহার গাছের ছালে, চন্দনের গন্ধ তাহার কাঠে, খসখসের গন্ধ তাহার শিকড়ে, লেবু ও কমলার গন্ধ তাহার ফলে, জিরে, মৌরি ইত্যাদির গন্ধ তাহার বীজে, এবং ধুনার গন্ধ গাছের আঠায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে সকল প্রকার ফুল ইত্যাদির গন্ধ দেশ ও আবহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এখন, তাহা হইলে, তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে গন্ধ কি জিনিস এবং কেন হয়। গন্ধ কি জিনিস তাহা বোধহয় কতকটা বলিতে পারা যায় কিন্তু কেন হয় ইহা বলা বড় কঠিন। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তোমরা বোধ হয় জানিতে চাও যে ফুলের ভিতর হইতে তাহার গন্ধ বাহির করিতে পারা যায় কিনা? হ্যাঁ, তাহা পারা যায় ও সকল প্রকার সুগন্ধ যুক্ত ফুল হইতে তাহার গন্ধ বাহির করা হইতেছে। অধিকাংশ গন্ধ পদার্থ দেখিতে তেলের মতন। কিন্তু প্রভেদ এই যে গন্ধ তেল গরম বাষ্পের সাহত উড়িয়া বাষ্পীভূত হইতে পারে। এবং সাধারণ তেল যেমন তিল, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তাহা পারে না। এইজন্য গন্ধ তেলকে আতর বা (Eessential oil) বলা হয়। ফুল, ফল ইত্যাদিতে এই গন্ধ তেলের পরিমাণ অতিশয় সামান্য কিন্তু আতরের গন্ধ এত তীব্র যে ক্ষুদ্র পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তাহা বেশ পাওয়া যায়। তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে চার হাজার গোলাপ হইতে এক ফোঁটা আতর পাওয়া যায়।

গন্ধ পদার্থ বাহির করিবার উপায় মোটের উপর তিন প্রকার যথা (১) বাষ্প দ্বারা (২) যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া এবং (৩) কোন তরল পদার্থের ভিতর ডুবাইয়া। এই তিন উপায়ের ভিতর বাষ্পের সাহায্যে বাহির করাই পুরাতন প্রথা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) যখন ফুল ইত্যাদি কোন পাত্রের ভিতর রাখিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করা হয় তখন ফুল হইতে আতর বাহির হইয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। পরে যখন এই মিশ্রিত বাষ্প আবার ঠাণ্ডা করা হয় তখন আতর জলের উপর ভাসিয়া থাকে ও সহজেই জল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। অবশিষ্ট যে জল থাকিয়া যায় তাহাও খুব সুগন্ধ যুক্ত হয় এবং ইহাই তোমাদের পরিচিত গোলাপ জল বা কেওড়ার জল ইত্যাদি। ফুলের নাম অনুসারে জলের এইরূপ নামকরণ করা হয়। এই উপায়ে গোলাপ, কেওড়া, লেভেণ্ডার, মোতিয়া, খসখস, দোওয়ান, চন্দন আরও অনেক দ্রব্য হইতে আতর বাহির করা হয়। ইহাতে যন্ত্রাদির আবশ্যিকতা খুব কম সুতরাং খরচও খুব অল্প এবং যন্ত্রাদি যাহা লাগে তাহাও সহজ উপায়ে চালানো যাইতে পারে। এইজন্য আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপায় অবলম্বন করা হয়। একটি তাম্র বা লৌহ পাত্রে ফুল ভরিয়া তাহাতে খানিকটা জল ঢালিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দেওয়া হয়, উনানে আচ অল্প রাখা হয়, পাত্রের মুখের উপর এমন একটি ঢাকনা থাকে যাহাতে কেবলমাত্র একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র হইতে একটি কাঠের তামার নল বাহির করিয়া অপর একটি নলের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় নলটি জলের চৌবাচ্চার ভিতর রাখিয়া সর্বদা ঠাণ্ডা করা হয়। নলের অপর মুখের নীচে একটি পাত্র রাখিয়া নলের ভিতর হইতে যাহা বাহির হয় তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে এই উপায়ে আতর বাহির করিতে হইলে খুব সাবধানে কাজ করিতে হয় কারণ যদি কোন সময়ে আগুনের উত্তাপ বেশী হয় তাহা হইলে আতরের মূল্য অনেক কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণের জন্য আধুনিক কারখানায় জলীয় বাষ্প ফুলের পাত্র হইতে অন্যত্র উৎপাদন করিয়া পরে ফুলের ভিতরে দেওয়া হয়। অনেক সময় ইহা ব্যতীত ফুলের পাত্রটি আর একটি পাত্রের ভিতরে বসানো থাকে। এই

দ্বিতীয় পাত্রের ভিতর দিয়া বাষ্পাধার হইতে বাষ্প আনাইয়া ফুলের পাত্রটি গরম রাখা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে ফুল কোনক্রমেই অধিক মাত্রায় গরম হইয়া পুড়িতে পারে না।

কেবলমাত্র লেবুর খোসার গন্ধ তেল চাপ প্রণালীতে বাহির করা হয়। তোমরা হয়ত ইটালী প্রদেশের নাম অনেকেই শুনিয়াছ। এখনও ইটালীর দক্ষিণ ভাগে সিসিলি দ্বীপে এই উপায়ে লেবুর গন্ধ বাহির করা হইতেছে। বেশীর ভাগ গন্ধরস হাত দিয়া নিঙরাইয়া লওয়া হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক ফুল ও লতাপাতা হইতে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে আতর বাহির করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা হইতে এই উপায়ে আতর বাহির করা হইলে আতরের গন্ধ অল্প বিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ হইবার বোধ হয় প্রধান কারণ এই যে এই সকল গন্ধ বস্তু এত কোমল ও সূক্ষ্মস্পর্শী যে তাহা জলীয় বাষ্পের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উষ্ণ জলীয় বাষ্প ব্যবহার না করিয়া অপর কোন তরল বস্তু বা কোন রকম তেল বা মোম বা চর্বি ঠাণ্ডা বা গরম অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে আজও কনৌজের লোকেরা সাদা তিল ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পরে তাহা বেল, চামেলী ইত্যাদি ফুলের সহিত রাখিয়া দেয়। এইরূপে ফুলের গন্ধ তিলে প্রবেশ করে। পরে ঐ তিল যন্ত্রে পিষাই করিয়া তৈল বাহির করিয়া ও এই তৈল সুগন্ধিত তৈল বলিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। বলাই বাহুল্য যে এই চামেলীর তেলে আসল চামেলীর গন্ধ আতর খুব অল্প থাকে। প্রায় সবটাই খাঁটি তিলের তেল, আধুনিক বড় বড় কারখানায় তিলের পরিবর্তে ভাল চর্বি ব্যবহৃত হয়। ফুলের গন্ধ ভরা চর্বিকে পমেড বলা হয়। এই পমেড হইতে আসল আতর বাহির করিতে হইলে পমেড ও সুরা এক সঙ্গে মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে সেই চর্বি হইতে গন্ধ বাহির হইয়া সুরায় চলিয়া যায়। যেহেতু চর্বি সুরার সহিত মিশ্রিত হয় না। অতএব উহা সহজেই পৃথক করিয়া ফেলিতে পারা যায়। এইভাবে ফুল হইতে গন্ধ বাহির করাকে Enflemege process বলা হয়। বেলা, জুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা ইত্যাদির আতর এই উপায়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় বাহির করা হয়।

C/o-বিমলকৃষ্ণ ঘোষ, শচীন সেন রোড (রাধানগর), কৃষ্ণনগর।

শব্দকূট

স্বাতী রায়

১ ক্যা	x	২ সি	x	৪ ম
x	■	x	■	x
রি	৭ আ	৩ x	x	র
৬ কি	x	গ্রা	ম	■
■	ক	৫ ফ	x	ল

পাশাপাশি:

১। ধাতব মৌল (পাঁচ অক্ষরে নাম)।

৩। বহুল ব্যবহৃত গাড়ি।

৫। জীবাশ্মের ইংরেজী নাম।

৬। মেট্রিক পদ্ধতিতে ভরের একক।

উপর নিচে:

১। মেট্রিক পদ্ধতিতে তাপ মাপবার একক (তিন অক্ষরে নাম)।

২। ভূকম্পনের প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (পাঁচ অক্ষরে নাম)।

৪। ভারতের জাতীয় পাখি।

৭। এর উপস্থিতির জন্যে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জন্মে।

[গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।]

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.৫০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি *সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।*
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

R/ No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • May 1982 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
- ভেপান্তর ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

পশুপাখী-বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- বনেজঙ্গলে ১৫-০০
- পশুপক্ষী ১৫-০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
- পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ১০-০০

কেনেথ গ্রাহামসন
- বাঘের গর্জন ১৫-০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৬-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

অমরনাথ রায়
- সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫-০০
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫-০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
- মেঘনাদ ৮-০০ লুপ্তধন ৮-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- বাঙলার ডাকাত
  চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০
- মহিম ডাকাত ১০-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হামাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বসু কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রন : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২